পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অষ্টম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত
নোটিফিকেশন নং ৬৮।৫৫, তাং ১৮।১০।৫৫ দ্রষ্টব্য

এ যুগের ইতিহাস

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

এম. এ. (কলিকাতা ও অক্সফোর্ড), বি. লিট. (অক্সফোর্ড),
ব্যারিষ্টার-এট-ল, এম. পি.
সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক,

ও

শ্রীসুকুমার মিত্র, এম. এ.

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, খাজুরা (যশোহর) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়,
প্রাক্তন বার্তা-সম্পাদক 'দৈনিক বসুমতী' ও 'সত্যযুগ'

প্রণীত

মহাজাতি প্রকাশক :: কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ : ১৩৬২
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৬২
তৃতীয় সংস্করণ : ১৩৬২

প্রকাশক :
শ্রীমহীতোষ বসু
মহাজাতি প্রকাশক
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার নাগ
ইমপ্রেশন
৩৩, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা—৬

মূল্য :
এক টাকা তের আনা মাত্র

সূচীপত্র

এ যুগের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১) রেনেসাঁস

নদীর জল যেমন বহিয়া চলে, ইতিহাসও তেমনই অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। কোথায় নদীর এক অংশ এবং কোথায়ই বা অপর অংশ, তাহা নদীস্রোতকে ভাগ করিয়া দেখানো যায় না। ইতিহাসের বেলাতেও তাহাকে একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা উচিত নয়। সারা ইতিহাসের মধ্যে ঐক্যের একটি সূত্র আছে বলিয়াই তোমরা প্রায় সকল দেশের ইতিহাস সংক্ষেপে পড়িতেছ।

তবুও ইতিহাসকে মোটামুটিভাবে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়ঃ প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক বা বর্তমান যুগ। এই যুগগুলির কয়েকটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইতিহাস তোমরা পড়িয়াছ। এখন বর্তমান বা আধুনিক যুগের ইতিহাস পড়িবে। আমরা যে যুগে বাস করিতেছি এই যুগকে আধুনিক যুগ বলা হয়। আধুনিক যুগ কখন হইতে সুরু হইল তাহা জানিবার আগে মধ্য যুগের অবস্থা একবার স্মরণ করা দরকার। প্রচলিত মত অনুসারে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক হাজার বৎসর ইতিহাসে মধ্য যুগ বলিয়া বর্ণিত হয়। মধ্য যুগে ধর্মগুরু, সম্রাট এবং সামন্ত বা ভূম্যধিকারীরাই ছিলেন সমাজে সর্বেসর্বা। তাঁহাদের আদেশ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা

দূরে থাকুক, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার কথাও মধ্য যুগে মানুষ প্রায় ভাবিতে পারিত না। যাহা অনেকদিন ধরিয়া প্রচলিত ছিল তাহাই চিরাচরিত বলিয়া লোকে মানিয়া লইত কেহ কোন নূতন কথা বলিলে তাহা বিপজ্জনক বলিয়া গণ্য হইত। সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাকে ঈশ্বরের বিধানরূপে সে যুগের মানুষ মানিয়া লইয়াছিল। বিধিলিপি খণ্ডন করা যায় না, অতএব পরলোকের কথা চিন্তা করাই শ্রেয়—ইহাই ছিল মধ্য যুগের সাধারণ মানুষের মনোভাব। ধর্মগুরু, সম্রাট ও ভূম্যধিকারীরা এই ধরণের মনোভাব সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিতেন এবং সমাজ চিরকালই এইভাবে চলিতেছে এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদেরও ছিল। এই অবস্থায় ধর্মের নামে যুক্তিহীন ও হৃদয়হীন অনুশাসন এবং সম্রাট, রাজা ও ভূম্যধিকারীদের স্বেচ্ছাচারী শাসন ও নিষ্ঠুর শোষণকে লোকে স্বাভাবিক বলিয়াই মানিয়া লইত। ইহারই ফলে বহুদিনের প্রচলিত রীতিনীতি, রাজা-রাজড়া ও ধর্ম-গুরুদের কর্তৃত্ব, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসংক্রান্ত অজস্র বিধিনিষেধ মধ্য যুগের মানুষ ও সমাজের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছিল।

ইয়োরোপে যে আন্দোলন এই অবস্থার অবসান ঘটাইয়াছিল, তাহাকে "রেনেসাঁস্ (বা নবজন্ম) বলা হয়। অনেকে বলেন যে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কীদের আক্রমণে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পতনের পরই এই জাগরণের সূত্রপাত ঘটে। কোন একটি ঘটনার জোরেই যুগ বদলাইয়া যায় না, কিন্তু এই ঘটনাটির গুরুত্ব ইতিহাসে খুব বেশী। সে যুগে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল (ইস্তাম্বুল) ছিল গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন চর্চার সর্বপ্রধান কেন্দ্র। তুর্কিরা শহরটি দখল করিলে গ্রীক পণ্ডিতেরা কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল ত্যাগ করিয়া

ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িলেন। ফলে মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপে নূতন করিয়া গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের অনুশীলন সুরু হইল। গ্রীক ভাবধারায় ইয়োরোপের মানুষ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল, স্বাধীন চিন্তার প্রেরণা লাভ করিল। এই নবজাগরণকেই 'রেনেসাঁস্' বলা হয়। ইহার ফলে ইয়োরোপের মানুষ অতীতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন এক মহত্তর সভ্যতার পথে অগ্রসর হইল।

রেনেসাঁস্

'রেনেসাঁসে'র আক্ষরিক অর্থ পুনর্জন্ম। গ্রীক ও রোমক সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানের অনুশীলনই ছিল রেনেসাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সভ্যতাকে নূতন করিয়া আবিষ্কার ও অনুশীলনের মধ্য দিয়া ইয়োরোপের মানুষ সেদিন মুক্ত জীবনের সন্ধান পাইয়াছিল। পুরাতন লুপ্তপ্রায় গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনরুদ্ধারের ফলে মানুষ নূতনভাবে জীবনকে দেখিতে শিখিল। সব কিছু জানিবার ইচ্ছা এবং যুক্তি ও তথ্য দিয়া যাচাই করার মনোভাব জাগ্রত হইল। বাঁচিয়া থাকার মধ্যে এক নূতন আনন্দ ও সুখকে মানুষ উপলব্ধি করিল।

ঐতিহাসিকরা রেনেসাঁস্ কালকে মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী সীমারেখা বলিয়া মনে করেন। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল পতনের পর মধ্য যুগের অবসান হয় বলিয়া প্রচলিত ধারণা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তন অকস্মাৎ হয় নাই। সর্বদাই ঐতিহাসিক রূপান্তর দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ঘটিয়া থাকে। আমরা বলিতে পারি যে ত্রয়োদশ শতক হইতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চারিশত বৎসর ধরিয়া বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক যুগের উদ্ভব ঘটে।

মধ যুগের শেষভাগে ইয়োরোপ অনড় অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল না। সে যুগেও ব্যাপকভাবে বিদ্যাশিক্ষার চর্চা হইয়াছে, নানাবিষয়ে

প্রশ্ন উত্থাপন করার এবং উত্তর জানিবার আগ্রহ ও উৎসাহ সে যুগেও ছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে প্যারিস, বলোনা, সালের্নো, অক্সফোর্ড প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং প্রাচীন গ্রীক দর্শনের রীতিমত চর্চা সুরু হয়। অধ্যয়নের বিষয় বা অধ্যয়নের পদ্ধতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ থাকিলেও গ্রীক দর্শন প্রভৃতির চর্চা ঐ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে হইত। ভার্জিল, সীজার ও সিসেরো প্রভৃতি রোমক লেখকদের গ্রন্থও মধ্য যুগে পঠিত হইত। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টট্‌ল যীশু গ্রীষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী মনীষী হইলেও গ্রীষ্টীয় ধর্মগুরু পোপ হইতে সুরু করিয়া মধ্যযুগের সকল বিদ্বান্ ও ধার্মিক তাঁহার রচনা শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। মধ্যযুগের আইনশাস্ত্র, চিকিৎসাতত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ উৎস ছিল প্রাচীন গ্রীক ও রোমক রচনাবলী। এইভাবে চিন্তা জগতে যে আলোড়নের সূচনা হয় তাহার সমুজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায় রেনেসাঁস্-এ।

ইটালিতেই রেনেসাঁস্ আন্দোলনের পত্তন হয়। ইহার নানা কারণ ছিল। ইয়োরোপে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে মধ্যযুগের শেষভাগে বড় বড় শহরগুলি ব্যবসা, বাণিজ্য ও সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল শহর হইতেই পশ্চিম ইয়োরোপে রেনেসাঁস্ ছড়াইয়া পড়ে। রোম ও গ্রীসের যে পুরাতন সভ্যতার কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহাকেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালির জনসাধারণ যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল। প্রাচীন সংস্কৃতি তাহাদিগকে মুগ্ধ করিল এবং মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। "ক্রুসেড" বা ইসলামের বিরুদ্ধে গ্রীষ্টানদের ধর্মযুদ্ধের সময় ইটালির শহরগুলি ব্যবসাবাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করে। সমৃদ্ধিশালী ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস প্রভৃতি ইটালীয়

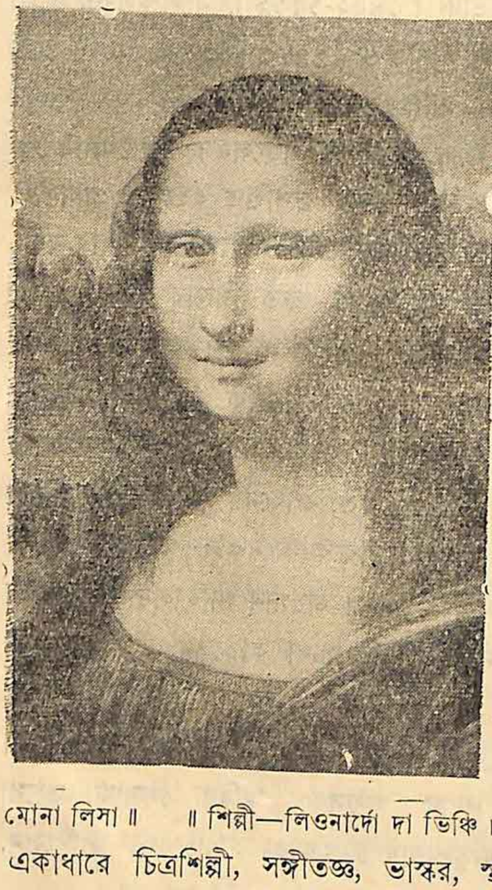
শহরগুলি সংস্কৃতির বড় বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়। স্থানীয় শাসক ও ধনী বণিকরা এই সংস্কৃতির প্রসারে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই সময় ইটালিতে যে সমস্ত মনীষী ও শিল্পী নূতন ভাবধারা প্রচার করেন তাঁহারা "হিউম্যানিস্ট" বা মানবতাবাদী বলিয়া খ্যাত।

হিউম্যানিস্ট বা মানবতাবাদী

সাহিত্যে ফ্রান্‌সেস্কো পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪) ও বোকাচিও, শিল্পে ও ভাস্কর্যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯), মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) ও রাফায়েল সান্‌জিও (১৪৮৩-১৫২০), রাজনীতিতে নিকোলাস মাকিয়াভেল্লী (১৪৬৯-১৫২৭) হিউম্যানিস্টদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। হিউম্যানিস্টরা ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও প্রধানতঃ মাতৃভাষায় সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের চর্চা করিতেন। ইহার ফলে তাঁহাদের ভাবধারা জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতা মানুষকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এমন কি তখন দেবদেবীর চরিত্রকে অনেকটা মানুষের মতই কল্পনা করা হইত। অপর পক্ষে খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা ইহজীবনের অপেক্ষা পরলোককে বড় করিয়া দেখাইত, জীবনের বন্ধন হইতে মুক্তির বাণী প্রচার করিত। সেই ধর্মের প্রভাবকে অনেকটা কাটাইয়া প্রাচীন গ্রীস ও রোমের আদর্শে যাঁহারা জীবনের জয়গান গাহিলেন এবং নূতন করিয়া সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি প্রভৃতি রচনা করিলেন, তাঁহাদের তাই মানবতাবাদী বলা হইয়াছে।

ইটালীয় ভাষায় মহাকবি দান্তে ইতিপূর্বেই মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পেত্রার্ক, তাসো প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিরা মাতৃভাষায় চমৎকার কবিতাবলী লিখিলেন, বোকাচিও লিখিলেন ছোট গল্প।

এইভাবে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। ইটালির নগর-রাষ্ট্রগুলির রাজনীতি ও কূটনীতি পর্যালোচনা করিয়া নিকোলাস মাকিয়াভেল্লী "দি প্রিন্স" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার মতে রাজনীতিতে দয়ামায়ার স্থান নাই, নীতিবোধও সেখানে অচল। রাষ্ট্রে যে কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করিয়া থাকাই রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য। ইয়োরোপে এই মতবাদের প্রভাব নানা দেশে ও নানা যুগে লক্ষ্য করা যায়।



মোনা লিসা ॥ ॥ শিল্পী—লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

হিউম্যানিস্টদের মধ্যে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। শিল্প ও বিজ্ঞানে সমান প্রতিভার এমন অপূর্ব সমাবেশ আর কাহারো মধ্যে দেখা যায় নাই। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছিলেন ফ্লোরেন্সের নাগরিক। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, ভাস্কর, স্থপতি, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও দার্শনিক। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অঙ্কিত 'মোনা লিসা'

বা ("লা জিওকোন্দা") এবং 'লাস্ট সাপার' (শেষ নৈশভোজ) নামক দুইটি চিত্র বিশ্ববিখ্যাত।

লিওনার্দোর পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তর ইটালীতে একটি খাল কাটা হইয়াছিল ও মিলানে একটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। যন্ত্র-বিদ্যাতেও তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তাঁহার নির্মিত কয়েকটি সিংহ জীবন্ত সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া ফ্রান্সের তৎকালীন রাজাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মৌলিক রচনাবলীর পরিমাণও বিপুল। তাঁহার বিশ্বজয়ী প্রতিভা আজও জগতের বিস্ময় উদ্রেক করে।

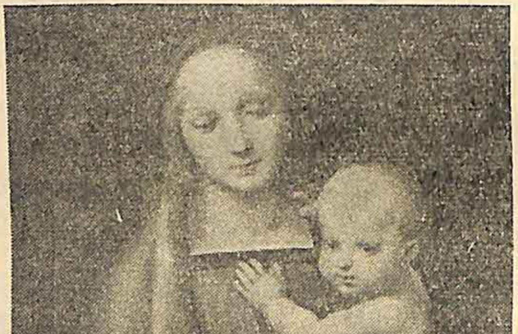
মাইকেল এঞ্জেলো এবং রাফায়েলও বিরাট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ভাস্কর্যে মাইকেল এঞ্জেলো অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন করিয়া



আদম ('সৃষ্টি' নামক প্রাচীর-চিত্রের একাংশ) ॥ শিল্পী—মাইকেল এঞ্জেলো ॥

গিয়াছেন। তিনি যেন যাদুমন্ত্রে পাথরকে সজীব ও প্রাণচঞ্চল মূর্তিতে পরিণত করিতেন। স্থপতিরূপে মাইকেল এঞ্জেলো বিশ্ববিখ্যাত গির্জা সেণ্ট পিটার্স কেথীড্রলের নক্সা প্রস্তুত করেন। দেশ-প্রেমিক

রূপে তিনি স্বৈরাচারী মেডিচি পরিবারের হাত হইতে ফ্লোরেন্সের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং গণতন্ত্রের পতন হইলে তিনি গভীর শোকে অভিভূত হইয়া যে কবিতা রচনা করেন মহাকবি দান্তে ও পেত্রার্কের রচনার পরেই তাহা স্থান পাইয়া থাকে।

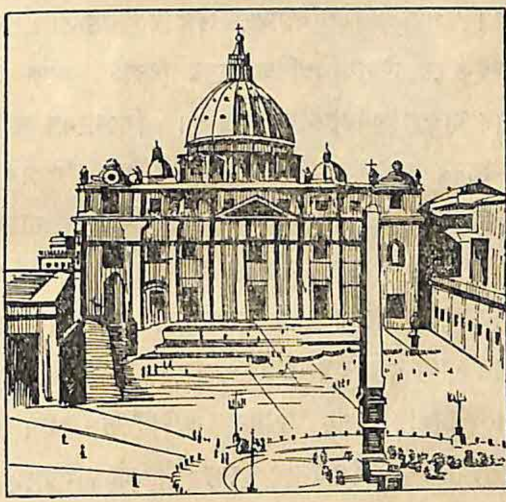


মাতৃমূর্তি ॥ শিল্পী—রাফায়েল ॥

রাফায়েল ছিলেন একান্ত ভাবেই চিত্র-শিল্পী। অসংখ্য বিষয়ে এত বিচিত্র ও সৌন্দর্যময় অজস্র চিত্র পৃথিবীর প্রায় কোন চিত্রশিল্পী আঁকিতে পারেন নাই। রাফায়েলের ম্যাডোনা বা মাতৃমূর্তি সারা পৃথিবীতে পরিচিত।

স্থাপত্যেও এই সময় ইটালিতে নূতন যুগের সূচনা হয়। প্রাচীন গ্রীক, রোমক ও বাইজান্তিয়ান রীতি অনুসরণ করিয়া স্থপতিরা গীর্জা, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। এইগুলির মধ্যে সৌন্দর্যের জন্য পৃথিবীর বৃহত্তম গীর্জা সেণ্টপীটার্স কেথীড্রল বিখ্যাত। "গথিক" রীতিতে নির্মিত মিলানের কেথীড্রলও চমৎকার স্থাপত্যের নিদর্শন।

জগৎকে জানিতে হইলে এবং জীবনকে সহজ করিয়া তুলিতে হইলে বিজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন ঘটে। রেনেসাঁসের যুগে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান চর্চাও ব্যাপকভাবে সুরু হয়। বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোপেরনিকাস একজন পোলিশ পাদ্রী ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি দশ বৎসরকাল ইটালীতে থাকিয়া চিকিৎসাবিজ্ঞান ও



সেন্টপীটার্স কেথীড্রেল

অন্যান্য শাস্ত্রের চর্চা করেন। পরে তিনি অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করেন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং সেই বৎসরই গ্রহ নক্ষত্রের পরিবর্তন সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত রচনা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রচলিত ধারণাকে উলটাইয়া দিয়া কোপেরনিকাস প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী লাটিমের মত ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই যুগে ইটালীতে আর একজন

বিজ্ঞানী খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার নাম গ্যালিলিও। গ্যালিলিও অঙ্কশাস্ত্র, যন্ত্রবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন এবং সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। লেখক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। কোপেরনিকাসের মতবাদকেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্যালিলিও-ই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করেন। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য এমন ভিড় হইত যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট কক্ষে দুই হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নূতন সত্য ধর্মযাজকদের বুঝাইতে গিয়া গ্যালিলিও বিপদে পড়িলেন। গির্জার আদালতে তাঁহার বিচার হইল। বিচারে গ্যালিলিও ধর্ম-বিরোধী এবং আজগুবী তত্ত্ব প্রচার করার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হন। কঠোর শাস্তি দানের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে সত্য প্রচারে বিরত থাকিতে বাধ্য করা হয় এবং পাদ্রীদের কড়া নজরে থাকিয়া গ্যালিলিওকে তাঁহার শেষ জীবন কাটাইতে হয়। বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের মধ্যে দ্বন্দ্ব এই ঘটনার মধ্যে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

গ্যালিলিও

রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে (১৫৫৮-১৬০৩) ইংল্যাণ্ডে রেনেসাঁসের ভাবধারা ছড়াইয়া পড়ে এবং বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়র ও দার্শনিক বেকনের রচনাবলীতে তাহা চরম অভিব্যক্তি লাভ করে।

উইলিয়াম শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী শুধু ইংরাজী সাহিত্যের নয়, বিশ্বসাহিত্যেরও এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি" বলিয়া বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র শেক্সপীয়রের বন্দনা করিয়াছেন। অসংখ্য চরিত্র ও বিচিত্র

রাণী এলিজাবেথের যুগে ইংল্যাণ্ড—শেক্সপীয়র ও বেকন

ঘটনা সংস্থাপনের মধ্য দিয়া মহাকবি শেক্সপীয়র এমন এক জগতকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন যে মানুষ নূতন এক জীবনের আস্বাদ পাইয়াছে।



॥ শেক্সপীয়র ॥

ফ্রান্সিস বেকন বহু দার্শনিক গ্রন্থের রচয়িতা। বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। দর্শনের তত্ত্ব বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন ইহাই ছিল তাঁহার মূল বক্তব্য। বেকন ইংরাজী প্রবন্ধ সাহিত্যেরও আদি গুরু।

এই যুগে হল্যাণ্ড চিত্রশিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। হল্যাণ্ডের চিত্রশিল্পীরা ফ্লেমিশ ও ডাচ এই দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রুবেন্স (১৫৭৭-১৬৪০) সকল বিষয় লইয়াই চিত্র অঙ্কন করেন। বিচিত্র বর্ণের সমারোহ ও অলঙ্করণ তাঁহার চিত্র-শিল্পের বৈশিষ্ট্য। রুবেন্স 'ফ্লেমিশ' (রুবেন্স হল্যাণ্ডের যে অংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা এখন বেলজিয়ামের ফ্লেমিশভাষী অঞ্চল) চিত্রশিল্পীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভ্যান ডাইক (১৫৯৯-১৬৪১) প্রতিকৃতি অঙ্কনের জন্য প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন।

ডাচ (ওলন্দাজ) চিত্রশিল্প

'ডাচ' সম্প্রদায়ভুক্ত চিত্রশিল্পীরা ছিলেন 'বাস্তবধর্মী'। পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি অবলম্বনে চিত্রাঙ্কণে এই সকল চিত্রশিল্পীর আগ্রহ ছিল না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি অঙ্কণে এই সকল চিত্রশিল্পী পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। রেমব্রাণ্ট, ভ্যান রিন (১৬০৬-১৬৬৩) এই সকল চিত্রশিল্পীর মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেন।

মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে রেনেসাঁসের যুগের নূতন ভাবধারা সমগ্র ইয়োরোপে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।[১] পূর্বে হাতে লেখা পুঁথিই ছিল লেখাপড়ার একমাত্র অবলম্বন। ইহা নকল করিতে দীর্ঘকাল কাটিয়া যাইত। জার্মানীর মাইন্‌ৎস্ (Mainz) শহরে য়োহান গুটেনবার্গ সীসার হরফ আবিষ্কার করার পর বই ছাপার সুবিধা হইল। ১৪৭৭ খ্রীঃ অব্দে ক্যাক্সটন নামক এক ইংরাজ মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বহু সংখ্যক বই ছাপা সম্ভব হইল এবং বই-এর দামও কমিয়া গেল। হাতে লেখা পুঁথিতে যেরূপ ভুল থাকিত সেরূপ ভুল থাকার সম্ভাবনা ছাপা বইয়ে অনেক কমিয়া গেল।

---

১ চীনদেশে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, যদিও অন্যান্য দেশ সেই আবিষ্কারের ফল ভোগ করে নাই।

(২) সংস্কার আন্দোলন

রেনেসাঁস্ আন্দোলন আলপ্‌স অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের রূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল। রেনেসাঁস আন্দোলন ইটালিয়ানদের মনে জাগাইয়াছিল আরাম ও বিলাসপূর্ণ জীবন যাপনের স্বাদ এবং গ্রীস ও রোমের প্রাচীন ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতায় ফিরিয়া যাইবার বাসনা। কিন্তু উত্তরের জাতিগুলির মধ্যে রেনেসাঁস্ জাগাইয়াছিল সমালোচনার স্পৃহা ও পুরাতন অভ্যাস সমূহের বিরোধিতা করার মনোভাব। রেনেসাঁস উত্তরাঞ্চলে জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ইটালি ও ইটালির উত্তরে অবস্থিত দেশগুলিতে রেনেসাঁসের প্রভাবের এই বিভিন্নতাই ধর্মসংগঠন বা চার্চের মধ্যে বিরাট পরিবর্তনের সৃষ্টি করে এবং এই পরিবর্তনকেই সংস্কার আন্দোলন (Reformation) বলা হয়।

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপের নেতৃত্বে রোমান-ক্যাথলিক চার্চেরই ছিল মধ্যযুগে ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে এই কর্তৃত্বের অবসান অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

পোপ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সন্ন্যাসী ও পাদ্রীদের মধ্যে বিলাস, আড়ম্বর, দুর্নীতি ও অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাব এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বের চরম অপব্যবহার ও ধর্মের নামে পুঞ্জীভূত কুসংস্কারকে সত্য বলিয়া প্রচারের ফলে পোপ এবং তাঁহার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যাপক হইয়া পড়ে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে রোমে কয়েকটি গুরুতর দুর্নীতির সহিত

পোপের সাঙ্গোপাঙ্গ জড়িত হয়। নানা কৌশলে ধর্মের নামে লোক-ঠকাইয়া অর্থার্জন করা পোপদের ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পোপের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অনেক পাদ্রী ও সন্ন্যাসীরাও অনুরূপভাবে অর্থ লুটিতেন।

মার্টিন লুথার

এই সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে জার্মানীতেই প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মার্টিন লুথার (১৪৮৫-১৫৪৬) উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্রে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি জার্মানীর এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ধর্মপ্রচারের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন ক্যাথলিক ধর্মমতের অনেক বিধানই বাইবেলের উপদেশের বিরোধী। পোপের আদেশে সে যুগে যাজকরা ইয়োরোপের সর্বত্র শুদ্ধিপত্র (Indulgence) বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। ইহা কিনিলে ক্রেতারা নাকি পাপের দায় এড়াইতে পারিত। লুথার উহার প্রতিবাদ করিয়া উইটেনবার্গ গীর্জার দেওয়ালে কয়েকটি মন্তব্য লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দিলেন। পোপ তাঁহাকে এই প্রতিবাদ প্রত্যাহার করার আদেশ দিলে লুথার তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তখন তাঁহাকে ধর্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এইভাবে বিরোধ সুরু হইল এবং মার্টিন লুথারের সমর্থক সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। প্রতিবাদ (Protest) হইতে উদ্ভব



মার্টিন লুথার

হয় বলিয়া তাঁহার ধর্মমতের নাম হইল "প্রোটেস্ট্যাণ্ট" মতবাদ এবং ধর্মসংস্কারের চেষ্টা হইতে উদ্ভুত বলিয়া এই আন্দোলনের নাম হইল সংস্কার আন্দোলন (Reformation Movement).

প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ

প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের আর একটি শাখার উদ্ভব হইল সুইজারল্যাণ্ডে। হুলড্রেইক ৎসভিংলি নামক একজন পাদ্রী পোপকে অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র বাইবেল অনুসরণ করিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। সাধুপূজা, ধর্মযাজকদের চিরকৌমার্য ইত্যাদির তিনি বিরোধিতা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জন ক্যালভিন চরমপন্থী প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত প্রচারে অগ্রণী হন। ১৫৩৬ খ্রীস্টাব্দে ক্যালভিন জেনীভায় উপস্থিত হন। জেনীভার শাসনকর্তা ও জনসাধারণের সমর্থনে ক্যালভিন জেনীভায় সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন এবং জেনীভা একরূপ ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত হয়। ক্যালভিন জেনীভায় কঠোর অনুশাসনের দ্বারা ঈশ্বরের শহর বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেন।

ধর্মসংস্কারকদের জীবন ছিল কঠোর ও অনাড়ম্বর। বিরোধী পক্ষের যুক্তি ভুল প্রমাণ করার জন্য তাঁহাদের যথেষ্ট পড়াশুনা করিতে হইত। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রচার ও আন্দোলন চালাইতে হইত। তাঁহাদের অনেক ক্ষেত্রে জীবন বিপন্ন হইত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জনও দিতে হইত। পক্ষান্তরে বিরোধীপক্ষের জীবন হানি করিতেও তাঁহারা দ্বিধা করিতেন না। ধর্মসংস্কারকরাও কম গোঁড়া ছিলেন না। ধর্মের নামে ক্যালভিন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মাইকেল সারভেটাসকে হত্যা করিতে দ্বিধা করেন নাই।

ইংল্যাণ্ডেও সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছিল। পোপের আধিপত্য জনসাধারণ আর সহ্য করিতে চাহিতেছিল না। রাজা ৮ম

হেনরী পোপের সমর্থনে লুথারের বিরুদ্ধে পুস্তক রচনা করিলেও শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যাপার লইয়া তাঁহার সহিত পোপের বিরোধ ঘটিল। নূতন আইন করিয়া রাজা ইংল্যাণ্ডের ধর্মসমাজের সর্বময় প্রভু হইয়া উঠিলেন। অর্থসংগ্রহের জন্য দুর্নীতি দমনের অজুহাতে রাজা ৮ম হেনরী বড় বড় ধর্মায়তন লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিলেন। ইহার ফলে রোমান ক্যাথলিকদের প্রভাব কমিয়া গেল।

পোপের আধিপত্য অস্বীকার করিলেও, রাজা ৮ম হেনরী প্রকৃত-পক্ষে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু পোপের আধিপত্য লুপ্ত হওয়ায় ইংল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত দ্রুত বিস্তারলাভ করে। ১৫৩৮ খ্রীঃ বাইবেলের এক নূতন ইংরাজী সংস্করণ (ক্র্যানমারের অনুবাদ) প্রকাশিত হইল এবং রাজার আদেশে উহা ইংল্যাণ্ডের প্রার্থনা পুস্তকরূপেও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। তখনও ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিকরাই প্রবল ছিল। রাজশক্তি ক্যাথলিক ধর্মের পক্ষপাতী হওয়ায় দীর্ঘকাল ইংল্যাণ্ডে প্রবল সংঘর্ষ চলে এবং শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে যে ধর্মসংস্কার গৃহীত হয় তাহাকে আংশিক সংস্কার বলা হয়। ইংল্যাণ্ডের চার্চ রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত এবং ইয়োরোপে প্রচলিত প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের মাঝামাঝি এক ধর্মমত অনুসরণ করে।

সংস্কার আন্দোলনের ফলে খ্রীষ্টীয় জগতের যে ঐক্য মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। ইহাতে ইয়োরোপ পর্যায়ক্রমে দীর্ঘকালব্যাপী ধর্মযুদ্ধে বিধ্বস্ত হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ধর্মমত সম্পর্কে সহিষ্ণুতার আদর্শ গ্রহণ করিয়া ইয়োরোপ ধর্মযুদ্ধ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। এই যুগে ভারতবর্ষ ও চীনে বিভিন্ন ধর্মমত প্রচলিত ছিল। কিন্তু ধর্মমত লইয়া এই দুইটি দেশে ঐ সময় ইয়োরোপের ন্যায় বিরোধ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় নাই।

ইয়োরোপের তুলনায় উভয় দেশেই লোকে অনেক বেশী পরমত সহিষ্ণু ছিল।

অনুশীলনী

(১) রেনেসাঁস্ বলিতে কি বুঝায়? রেনেসাঁস্ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(২) সংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর।

(৩) হিউম্যানিস্ট বা মানবতাবাদী বলিতে কাহাদের বুঝায়? কয়েকজন বিশিষ্ট মানবতাবাদীর নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(৪) নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও বিষয়গুলি সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ:— (ক) মার্টিন লুথার, (খ) শেক্সপীয়র, (গ) বেকন, (ঘ) লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, (ঙ) গ্যালিলিও, (চ) প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ।

(৫) ইংল্যাণ্ডে সংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

(৬) "রেনেসাঁসের যুগে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানচর্চা ব্যাপকভাবে সুরু হয়"—তথ্যাদিসহ ব্যাখ্যা কর। [Elucidate]

(৭) "আধুনিক যুগ অকস্মাৎ আরম্ভ হয় নাই, দীর্ঘকালব্যাপী পরিবর্তনের ফলেই আধুনিক যুগের সূচনা হয়"—ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভোগোলিক আবিষ্কার এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতার সূচনা

রেনেসাঁস্ ও সংস্কারের যুগে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহা হইতেছে ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং ইয়োরোপের সম্প্রসারণ। ক্রুসেডের পর প্রাচ্যের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ খুলিয়া গিয়াছিল। রেনেসাঁস্ ও সংস্কারের যুগে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করার হিড়িক পড়িয়া গেল। প্রধানতঃ বাণিজ্য বিস্তার ও খ্রীস্টধর্ম প্রচার এই দেশ আবিষ্কারের মূলে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র প্রেরণার জোরে এই আবিষ্কার সম্ভব হয় নাই।

মধ্যযুগের শেষভাগে সমুদ্রযাত্রায় ইয়োরোপীয়রা প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল এবং এই যুগেই ভৌগোলিক জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কম্পাস বা দিকনির্ণয় যন্ত্র, সমুদ্রপথের চার্ট ও মানচিত্র, অক্ষাংশ (Latitude) নির্ধারণ কৌশল ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতে থাকে। ভেনিসের পোলো ভ্রাতৃত্রয় স্থলপথে মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি অতিক্রম করিয়া চীন পর্যন্ত পৌঁছান। বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো এই ভ্রাতৃত্রয়ের অন্যতম। তিনি ১৭ বৎসর কাল চীনে বাস করেন। তাঁহার প্রাচ্যভ্রমণকাহিনী ইয়োরোপের লোকেরা বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে পাঠ করে এবং অনেকের মনে দেশ আবিষ্কারের প্রেরণা জাগায়। ক্রিস্টোফার কলম্বাস ইঁহাদেরই একজন।

এই যুগে ইটালিয় নাবিকরাই ছিল সমুদ্রযাত্রায় সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ। দেশ আবিষ্কারে তাহারাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু এই সময় পশ্চিম ইয়োরোপের অপেক্ষাকৃত নূতন রাষ্ট্রগুলিই

এই দেশ আবিষ্কারে উৎসাহ দেয়। ইটালীর পুরাতন নগর-রাষ্ট্রগুলি (City-States) এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয় নাই বা উৎসাহ দেখায় নাই। ইহার কারণ ছিল। ইটালিয় বণিকরাই এই সময় পশ্চিম ইয়োরোপে মালপত্র রপ্তানী করিয়া মুনাফা লুটিত। ভূমধ্য-সাগরই ছিল তখন সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান পথ। ইটালিয় বণিকরা তাই নূতন সমুদ্রপথ বা দেশ আবিষ্কারে উৎসাহবোধ করে নাই। পশ্চিম ইয়োরোপের বণিকরাই প্রাচ্য দেশের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। আমেরিকা ও প্রাচ্যের নূতন বাণিজ্য পথ আবিষ্কৃত হইবার ফলে আটলান্টিক মহাসাগর প্রধান বাণিজ্য পথ হইয়া দাঁড়ায় এবং আটলান্টিকের উপকূলবর্তী দেশগুলিই ইয়োরোপীয় ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হয়।

ক্রুসেডের পর ইটালিয়ান বণিকরা প্রাচ্যদেশ হইতে নানা প্রকার মশলা, হীরক ও মণিমাণিক্য, রেশম, সাটিন ও গালিচা প্রভৃতি তখনকার দিনে ইয়োরোপে দুষ্প্রাপ্য বহু প্রকার জিনিস আমদানি করিয়া ইয়োরোপে একচেটিয়া কারবার ফাঁদিয়া বসেন।

ক্রুসেড-প্রত্যাগতদের বর্ণিত প্রাচ্যদেশের অতুল ঐশ্বর্যের কাহিনী সেদিন বিপুল বিস্ময় জাগায়, ফলে মলক্কাস দ্বীপপুঞ্জের (Spice Islands) সমুদ্রপথ সন্ধানের জন্য পশ্চিম ইয়োরোপের মানুষ যেন পাগল হইয়া উঠে। এই যুগে ইটালিয় বণিকরা আরব ও অন্যান্য মুসলমান ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে মাল লইতেন।

সপ্তম শতাব্দীতে আরবরা মিশর ও পারস্য দখল করার পর ইয়োরোপের সহিত প্রাচ্যের বাণিজ্যে আরব বণিকরা একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেন। জলপথে পাল-তোলা জাহাজে করিয়া আরব বণিকরা প্রাচ্য দেশগুলি হইতে মালপত্র সুয়েজ বন্দরে লইয়া

যাইতেন। সেখান হইতে মিশরের ভিতর দিয়া স্থল পথে ঐ সমস্ত মালপত্র আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পাঠানো হইত। এখান হইতে ইটালিয় বণিকরা প্রাচ্যের, বিশেষ করিয়া ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিয়া চড়াদামে ইয়োরোপের বাজারে বিক্রয় করিতেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত ভারোচ (ব্রোচ, প্রাচীন ভৃগুকচ্ছ), ক্যাম্বে, সোপারা প্রভৃতি অসংখ্য ছোট বড় সমৃদ্ধিশালী বন্দর হইতে ইয়োরোপে মাল রপ্তানী হইত। সুদীর্ঘ কাল ইয়োরোপের সহিত বাণিজ্য করিয়াই উক্ত বন্দরগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। দক্ষিণ ভারতের কালিকট প্রভৃতি বন্দরও একই কারণে ঐশ্বর্যশালী হইয়াছিল।

আরব ও ইটালিয় বণিকদের ঐশ্বর্য দেখিয়া ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের বণিকদের হিংসা হইত। তাঁহারা আরব ও ইটালিয় বণিকদের এড়াইয়া প্রাচ্যের সহিত সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সরাসরি বাণিজ্য করিতে পারিলে প্রাচ্যের জিনিস অনেক কম দামে পাওয়া যাইবে বুঝিয়া ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের শাসকরা ও জনসাধারণও উহাতে বিশেষ উৎসাহ দেন।

অভিজ্ঞ ইটালিয়ান নাবিক এবং কম্পাস ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্য পাইয়া প্রাচ্য দেশের সহিত প্রথম প্রত্যক্ষ যোগস্থাপনে উৎসাহী হইল পর্তুগাল। পর্তুগাল তখন শক্তিশালী রাষ্ট্র। প্রাচ্যে বাণিজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় পর্তুগীজ রাজকুমার প্রিন্স হেন্‌রী (তাঁহার নামকরণ হয় নৌপর্যটক হেনরী—(১৩৯৪-১৪৬০) অভিজ্ঞ ইটালিয়ান নাবিক ও ভূগোলবিদ্‌দের সংগ্রহ করিয়া বৎসরের পর বৎসর সমুদ্র-যাত্রায় পরীক্ষাকার্য চালাইয়া আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত পৌঁছাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৪৮৮ খ্রীঃ অব্দে বার্থোলোমিউ দিয়াজ নামক একজন পর্তুগীজ

ক্যাপ্টেন আফ্রিকার একেবারে দক্ষিণ অংশে পৌঁছিয়া দেশে ফিরিলেন। পর্তুগালের তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় জন এই আবিষ্কারে উৎসাহিত হইয়া আবিষ্কৃত অঞ্চলের নাম রাখিলেন উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope), বার্থালোমিউ দিয়াজের পরেই ভাস্কো-দা-গামা নামক আর একজন পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতে উপনীত হইলেন। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ভারতের কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন এবং ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার যাতায়াতের ব্যয় অপেক্ষা ৬০ গুণ অধিক মূল্যের মালপত্র লইয়া ভাস্কো-দা-গামা লিসবনে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর পর্তুগীজরা, ভারত, সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মলক্কাস দ্বীপপুঞ্জ (Spice Islands) এবং চীন ও জাপানে বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন করে এবং নিয়মিত ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে থাকে।



ভাস্কো-দা-গামা

পর্তুগালের ন্যায় স্পেনও নূতন বাণিজ্য পথের সন্ধান করিতেছিল। ইটালিয়ান ক্যাপ্টেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস ছিলেন একজন-অভিজ্ঞ নাবিক। বিজ্ঞান ও ভৌগোলিক আবিষ্কারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। স্পেনের রাণী ইসাবেলাকে তাঁহার পরিকল্পনা জানাইলে, রাণী ইসাবেলা তাঁহাকে সাহায্য করেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের

আগস্ট মাসে তিনটি ক্ষুদ্র জাহাজে মাত্র ৮৭ জন লোক হইয়া কলম্বাস ভারত যাত্রার নূতন পথ আবিষ্কারে বাহির হইলেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তিনি ভারতভ্রমে আমেরিকায় অবতরণ করিলেন।

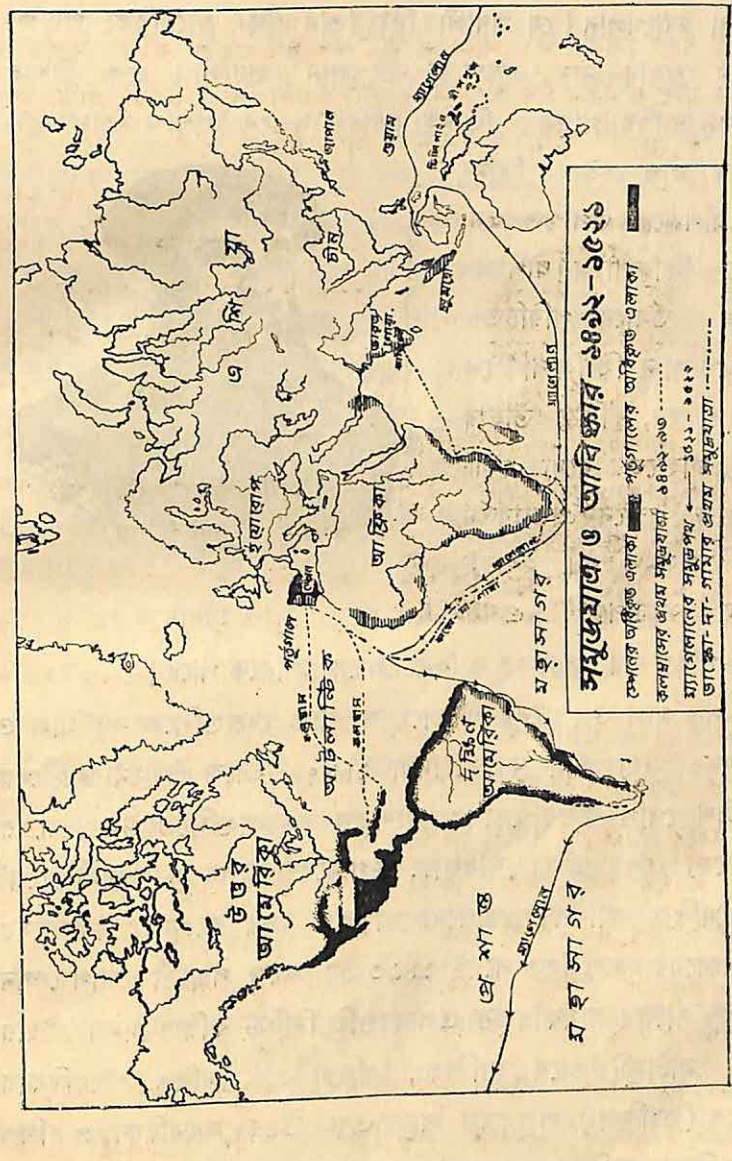


কলম্বাস

স্পেনে পৌঁছিয়া তিনি 'ইণ্ডিজ' বা ভারত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া জানাইলেন। কলম্বাস জানিতে পারেন নাই যে, তিনি এক নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করিয়াছেন।

কলম্বাসের পর আরও অনেক বিখ্যাত দেশ আবিষ্কারকের আবির্ভাব হয়। ক্রমে ইয়োরোপের লোকেরা বুঝিতে পারে যে কলম্বাস-আবিষ্কৃত মহাদেশ এশিয়া নহে। ১৫০৩ খ্রীঃ অব্দে আমেরিগো (ল্যাটিনে আমেরিকাস) ভেসপুচী নামক একজন দুঃসাহসী ইটালিয়ান একটি চিঠিতে নূতন মহাদেশ সে-ই আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করে। এই চিঠি প্রকাশিত হইবার চার বৎসর পর একজন জার্মান অধ্যাপকের প্রস্তাব অনুযায়ী উক্ত মিথ্যা দাবিদারের নামেই নূতন মহাদেশের নামকরণ হয় 'আমেরিকা'।

কিছুকাল পর্যন্ত ইয়োরেপীয়দের ধারণা ছিল যে আমেরিকা এশিয়া হইতে বেশী দূর নহে। পরে এই ধারণা দূর হয় এবং ১৫১৯ খ্রীঃ অব্দে স্পেনের রাজার অধীনে চাকুরী লইয়া ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাগেলান নামক একজন পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন ইয়োরোপ হইতে আমেরিকা হইয়া এশিয়া যাত্রা করেন। দক্ষিণ আমেরিকা প্রদক্ষিণ


সমুদ্রযাত্রা ও আবিষ্কার—১৪৯২-১৫২২
স্পেনের অধিকৃত এলাকা
পর্তুগালের অধিকৃত এলাকা
কলম্বাসের প্রথম সমুদ্রযাত্রা ১৪৯২-৯৩
ম্যাগেলানের সমুদ্রপথ
ভাস্কো-দা-গামার প্রথম সমুদ্রযাত্রা
উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
আটলান্টিক
প্রশান্ত মহাসাগর
মহাসাগর
আফ্রিকা
ইয়োরোপ
এশিয়া
চীন
জাপান
পর্তুগাল
স্পেন
ম্যাগেলান

করিয়া ম্যাগেলান (যে প্রণালী দিয়া তিনি দক্ষিণ আমেরিকা প্রদক্ষিণ করেন তাহার নাম হইয়াছে ম্যাগেলান প্রণালী) এক বিশাল মহাসমুদ্রে গিয়া পড়েন। তিনিই ইহার নাম দেন 'প্রশান্ত মহাসাগর'। গুয়াম দ্বীপ হইয়া তিনি যে দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হন তাহা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ নামে বর্তমানে পরিচিত। ম্যাগেলান ফিলিপাইনে নিহত হন, কিন্তু তাঁহার ৫টি জাহাজের মধ্যে একটি জাহাজ স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হয়। ইহারই ফলে সমুদ্রপথে প্রথম বিশ্ব-পরিক্রমার বিস্ময়কর কাহিনী লোকে জানিতে পারে।


ম্যাগেলান

পর্তুগাল ও স্পেনের উদ্যোগে আবিষ্কৃত দেশগুলিকে পর্তুগাল ও স্পেনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের শালিশ পোপ উভয় দেশের অংশভুক্ত অঞ্চলগুলিতে উভয় দেশের বাণিজ্যে এক চেটিয়া অধিকার, উপনিবেশ স্থাপন ও 'বিধর্মী দেশে' রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের অধিকার মঞ্জুর করেন। কলম্বাসের আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই ১৪৯৩ খ্রীঃ অব্দে পরবর্তী পোপ স্পেন ও পর্তুগালের অধিকারভুক্ত এলাকাগুলি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ইহার ফলে মোটামুটি ভাবে আফ্রিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশ (ব্রাজিল) পর্তুগাল পায় এবং উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ স্পেনের ভাগে পড়ে।

পর্তুগাল সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে। ১৫০৫ খ্রীঃ অব্দে পর্তুগালের রাজা, ভারত শাসনের জন্য বড়লাটের পদসৃষ্টি করেন। বিখ্যাত পর্তুগীজ বড়লাট আলফোন্সো আলবুকার্ক ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধের সুযোগ লইয়া গোয়া শহর দখল করিয়া গোয়াকে প্রাচ্যে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। আলবুকার্ক কোচীন ও অন্যান্য কয়েকটি উপকূলবর্তী ভারতীয় শহরও দখল করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পর্তুগাল প্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। চীন, জাপান, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে ব্যবসাবাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন করিয়াই পর্তুগালকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। ব্যবসাবাণিজ্যে পর্তুগাল এই যুগে ইয়োরোপে শীর্ষস্থান অধিকার করে। আমেরিকায় একমাত্র ব্রাজিলে পর্তুগীজরা স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হয়।

স্পেন প্রধানতঃ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই দেশ আবিষ্কার ও জয় করিয়াছিল। আমেরিকায় স্পেন মেক্সিকো ও পেরু জয় করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করে। উভয় দেশের বিশেষ করিয়া মেক্সিকোর সভ্যতা বেশ উচ্চতরের ছিল। স্থানীয় অধিবাসী "রেড ইণ্ডিয়ানরা" কামান, বন্দুক প্রভৃতি আধুনিক মারণাস্ত্রের গর্জন শুনিয়া স্প্যানিয়ার্ডদের দেবতা বলিয়া মনে করিয়াছিল। ঘোড়া ও সমুদ্রগামী জাহাজও তাহারা কখনও দেখে নাই। কাজেই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া স্প্যানিয়ার্ডদের মেক্সিকো ও পেরু জয় করিতে বেগ পাইতে হয় নাই। তথাপি 'রেড ইণ্ডিয়ান' বলিয়া ইয়োরোপীয়দের নিকট পরিচিত মূল অধিবাসীরা শেষ পর্যন্ত বীরত্ব সহকারে লড়িয়াছিল, কিন্তু কামান ও বন্দুকের সম্মুখে তাহাদের টিকিয়া থাকার কোন সম্ভাবনা ছিল না। স্প্যানিয়ার্ডরা জয়লাভ করিয়া অপরিমেয় স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং বহু খনি ও

বাগিচায় পূর্ণ বিশাল এলাকার অধিকারী হইল। এই ভাবে বিরাট স্পেনীয় সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

স্পেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করে। স্পেন ও পর্তুগালের সাফল্য এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারে একচেটিয়া অধিকার ডাচ্ (ওলন্দাজ), ফরাসী ও ইংরাজদের মনে বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলে। দেখিতে দেখিতে তীব্র প্রতিযোগিতা সুরু হইয়া যায়। ইংরাজরা স্পেনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়া নৌবলে বলীয়ান হইয়া উঠে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরাজরা প্রাচ্যদেশে ও আমেরিকায় বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়। হল্যাণ্ড এই সময় ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। ১৫৯৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে ডাচরা পর্তুগীজ ও স্প্যানিয়ার্ডদের হটাইয়া যবদ্বীপ, সুমাত্রা, সিংহল, মালয়, ফরমোজা, বোর্ণিও, সেলিব্স প্রভৃতি দেশ অধিকার করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকাতেও তাহারা সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়। ভারতে ও উত্তর আমেরিকাতেও সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য লইয়া ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব চলে।

ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার ঘটে এবং সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ইয়োরোপের সভ্যতা ও প্রভাব সারা জগতে ছড়াইয়া পড়ে।

অনুশীলনী

(১) "রেনেসাঁসের ও সংস্কারের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইতেছে ভৌগোলিক আবিষ্কার ও ইয়োরোপের সম্প্রসারণ"—বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

(২) নিম্নলিখিত দেশ-আবিষ্কারকদের সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ :—
(ক) ভাস্কো-দা-গামা, (খ) কলম্বাস, (গ) ম্যাগেলান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুঘল শাসনে ভারত

ইয়োরোপে যখন রেনেসাঁস্ ও সংস্কার আন্দোলনের গৌরবময় অধ্যায় রচিত হইতেছে ভারতে তখন মুঘল সম্রাটদের শাসনকাল। ভারতে মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন তুর্কী। পিতা ও মাতা উভয়ের দিক দিয়া তিনি বিশ্ববিজয়ী বীর তৈমুর ও চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর ছিলেন। বাবরের জীবন বৈচিত্র্যময়। দ্বাদশবর্ষ হইতেই তাঁহাকে তরবারী হস্তে জীবন সংগ্রাম সুরু করিতে হয়। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি সমরখন্দ অধিকার করেন। ইতিপূর্বেই তিনি তৈমুরের উত্তরাধিকারীরূপে ফরগণা রাজ্য পাইয়াছিলেন। তৈমুরের অন্যান্য বংশধরদের সহিত বিরোধের ফলে শেষ পর্যন্ত দুইটি রাজ্যই বাবরের হস্তচ্যুত হয়। অবশেষে ১৫০৪ খ্রীঃ অব্দে বাবর কাবুল জয় করেন। পুনরায় সমরখন্দ অধিকারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলে বাবরের দৃষ্টি হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষের দিকে পড়ে। ভারতে তখন আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদী রাজত্ব করিতেছিলেন। ইব্রাহিম লোদীর উপর অনেকেই সন্তুস্ট ছিলেন না। নানারূপ চক্রান্তের ফলে দিল্লীর সুলতানদের শাসন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় সুযোগ



বাবর

বুঝিয়া বাবর আঘাত হানিলেন। ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইয়া গেল। বাবর কালবিলম্ব না করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। এই ভাবে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ইহার পর বাবরকে রাণা সংগ্রাম সিংহ ও ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। সমস্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাবর তাঁহার রাজ্যসীমা একদিকে অক্ষুনদীর (Oxus) তীর হইতে বঙ্গের প্রান্তসীমা এবং অপর দিকে হিমালয় হইতে গোয়ালিয়র অবধি বিস্তার করেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও বাবর শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তোলার সুযোগ পান নাই। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু (১৫৩০) হয়।

বাবরের চরিত্র নানাদিক দিয়া অসাধারণ ছিল। তিনি রণনিপুণ সেনানায়ক ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। সাহিত্য, চারুকলা, ও সঙ্গীতেও তাঁহার বিস্ময়কর অধিকার ছিল। মাতৃভাষা তুর্কীতে রচিত বাবরের মনোহর 'আত্মচরিত' বিশ্বসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। মানুষ হিসাবেও বাবরের চরিত্র উল্লেখযোগ্য।

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুন সুশিক্ষিত ও রণনিপুণ হইলেও কর্মদক্ষ ছিলেন না।

শের শাহ্

এই সময় জনৈক আফগান জায়গীরদারের পুত্র শের শাহের নেতৃত্বে আফগানরা আবার প্রবল হইয়া উঠে। শের শাহ্ হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। পরাজিত হুমায়ুন পারস্যরাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শের শাহ্ মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যে নিজ প্রতিভাবলে শের শাহ্ সামান্য অবস্থা হইতে

শুধু ভারতের সম্রাট হন নাই, মাত্র পাঁচ বৎসরব্যাপী শাসনকালে তিনি যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাহাই ভবিষ্যতে সম্রাট আকবরের নিকট আদর্শস্থানীয় বিবেচিত হইয়াছিল। মুদ্রানীতির সংস্কার প্রজাদের কর নির্ধারণের সুব্যবস্থা, পথ-ঘাট নির্মাণ, ডাক বিভাগের উন্নতি সাধন, বিচারের সুব্যবস্থা, সেনাবিভাগে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বহু উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা শের শাহ্ প্রবর্তন করিয়া যান।

গোঁড়া মুসলমান হইলেও শের শাহের ধর্মান্ধতা ছিল না এবং হিন্দুদের প্রতি তিনি কোন অন্যায় আচরণ করেন নাই। শের শাহ্ সাহিত্যপ্রেমিক ও শিল্পানুরাগীও ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর সূচনা তাঁহার রাজত্বকালেই হইয়াছিল। সাহিত্যে 'পদ্মাবতী' কাব্য এবং শিল্পে সাসারামে তাঁহার বিখ্যাত সমাধি ভবন উহারই দৃষ্টান্ত। মধ্য যুগের ভারতে শের সাহের ব্যক্তিত্ব সত্যই উল্লেখযোগ্য। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে ভারতে মুঘল রাজবংশের পুনরায় ক্ষমতা লাভের কোন আশা থাকিত না।

হুমায়ুনের রাজ্য বিস্তার

শের শাহের মৃত্যুর পর আফগানদের মধ্যে বিরোধ বিসংবাদ আরম্ভ হইল। সুযোগ বুঝিয়া পারসিক সৈন্যদের সহায়তায় কান্দাহার জয় করিয়া হুমায়ুন ক্রমে ক্রমে দিল্লী ও আগ্রা জয় করেন। কিন্তু পিতা বাবরের ন্যায় হুমায়ুনও কোন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিঁড়ির ধাপে পিছলাইয়া পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। হুমায়ুনের পুত্র আকবর তখন তেরো বৎসরের বালকমাত্র। তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া অভিভাবকরূপে প্রবীণ বৈরাম খাঁ রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় অভিযানকারী হিন্দু যোদ্ধা হিমুকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬) করার পর আকবর

স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণে উদ্যোগী হন। ছয় বৎসরের মধ্যে অভিভাবক বৈরাম খাঁ ও উচ্চাভিলাষী কর্মচারীদের সরাইয়া দিয়া ১৫৬২ খ্রীঃ অব্দে আকবর বিশ বৎসর বয়সে স্বয়ং রাজ্য ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে আকবর তাঁর দিগ্বিজয়ও সুরু করেন। ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের তিন চতুর্থাংশ আকবরের পদানত হয়।



আকবর

শুধু রাজ্য জয়েই নহে, শাসনকার্য পরিচালনাতেও আকবর অনন্যসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। সম্রাটই তখনকার দিনে সর্বেসর্বা ছিলেন, তাঁহার ইচ্ছাতেই সব কিছু হইত, তথাপি আকবর রাষ্ট্রশাসনে যে ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা ও শৃঙ্খলার প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা ভারতের ইতিহাসে বিরল।

আকবর বুঝিয়াছিলেন যে, মুসলমান ধর্মাবলম্বী মুঘল-পাঠানকে আর বিদেশী হিসাবে ভারতে থাকিলে চলিবে না। ভারতবাসী হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ভারতবাসী রূপেই তাহাদের ভারতে থাকিতে হইবে। তাই মুসলমানদের গোঁড়ামীকে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। সকল ধর্মের মানুষকে তিনি সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন, কাহারও প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ তিনি সহ্য করিতেন না। তিনি গোবধ, মক্কাতীর্থে ভ্রমণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করায় মুসলমান সমাজে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং নানাস্থানে বিদ্রোহও হয়,

কিন্তু এই সব বিদ্রোহ দমনের পর আকবর সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনের চেষ্টা স্বরূপ 'দীন ইলাহী' নামে এক নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। ঈশ্বরের বিশ্বাসই ছিল ইহার মূলমন্ত্র। বলপূর্বক কাহাকেও আকবর এই ধর্মমত গ্রহণ করান নাই এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনেকে ইহার জন্য আকবরকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই সকল ব্যাপারে আকবরের খামখেয়ালী ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই। কিন্তু সেযুগে ধর্মসমন্বয়ের এই ব্যর্থ অথচ মহৎ প্রয়াসের মধ্য দিয়া সম্রাট আকবরের মনের যে উদারতা ও সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাসে তাহার স্থান উপেক্ষনীয় নহে।

সম্রাট আকবর নিরক্ষর হইলেও সংস্কৃতিবান ছিলেন। তাঁহার ধী-শক্তি ছিল অসাধারণ। পণ্ডিতমণ্ডলী যে সমস্ত বিষয় তাঁহার সম্মুখে আলোচনা করিতেন এবং যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন সমস্তই তাঁহার মনে থাকিত। শিল্প ও সাহিত্যে আকবরের অপরিসীম অনুরাগ ছিল। আবার কামান নির্মাণে, পোলো খেলা প্রভৃতিতেও তাহার আগ্রহ কম ছিল না। আকবরের চরিত্রে কোমল ও কঠোরের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি ছিলেন শত্রুর আতঙ্কের পাত্র, কিন্তু মিত্রের পরম বন্ধু। আকবর চাহিয়াছিলেন ভারতবাসীদের এক সূত্রে গাঁথিয়া মহাজাতিতে পরিণত করিতে কিন্তু সে যুগের আবহাওয়া ছিল উহার প্রতিকূল। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও উহা ভারতে এক মহৎ জীবনের সূচনা করিয়াছিল। আকবরের ন্যায় বুদ্ধিমান, কর্মদক্ষ ও উদার নরপতি জগতের ইতিহাসে সত্যই বিরল।

আকবরের মৃত্যুর পর যুবরাজ সেলীম জহাঙ্গীর নাম লইয়া

সিংহাসনে আরোহণ করেন। জহাঙ্গীর আকবরের ন্যায় পরধর্মমত-সহিষ্ণু ছিলেন। শাসনকার্যেও তিনি দক্ষতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান ও অহিফেন সেবন করিয়া দুর্বল ও অলস হইয়া পড়েন। জহাঙ্গীরের 'আত্মকথায়' তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা ও শিল্পানুরাগেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজে একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী ও শিল্পের সমজদার ছিলেন। প্রজানুরাগী এবং সহৃদয় হইলেও জহাঙ্গীর কখনও কখনও অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও খামখেয়ালীর পরিচয় দিতেন। তাঁহার চরিত্রের এই জটিল দিক অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

জহাঙ্গীর



জহাঙ্গীর

জহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ্‌জহান সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনের সমস্ত দাবিদারকে হত্যা করিয়া এবং নূরজাহানের সমস্ত ক্ষমতা লোপ করিয়া শাহ্‌জহান নিষ্কণ্টক হন। শাহ্‌জহান আড়ম্বরপ্রিয় ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। মাতৃভাষা তুর্কী ও ফারসী ভাষাতেও তাঁহার ভাল অধিকার ছিল। রাজপুত মায়ের পুত্র হইয়াও তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তাঁহার হিন্দু ও খ্রীষ্টান বিদ্বেষ কঠোর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। রাজনীতিক হিসাবে তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল না। ঐশ্বর্যমদে মত্ত শাহ্‌জহান মধ্য এশিয়ায় তাঁহার পূর্ব পুরুষদের রাজ্য অধিকারের জন্য বাল্‌খ্‌ ও বদখ্‌শান জয় করার চেষ্টায় কোটি কোটি টাকা অপব্যয় করেন।

শাসনকার্যে শাহ জহান দক্ষতা দেখাইয়াছেন। স্নেহপরায়ণ

পিতা ও পত্নীপ্রেমিক রূপে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁহার চরিত্র প্রিয় হইয়া আছে।

ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর সত্ত্বেও শাহ্‌জহানের রাজত্বকালেই মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। সাধারণ মানুষের জীবনে এই সময় দুর্গতি ও দারিদ্র্য ব্যাপক আকারে দেখা দেয়।



শাহ্‌জহান

শাহ্‌জহান কঠিন পীড়ায় (১৬৫৭) আক্রান্ত হইলে পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব সুরু হয়। এই দ্বন্দ্বে ঔরঙ্গজীব জয় লাভ করেন। ভ্রাতাদের অপসারিত করিয়া ঔরঙ্গজীব পিতাকে আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গে আমৃত্যু বন্দী করিয়া রাখেন।

ঔরঙ্গজীব

"আলমগীর" (বিশ্বজয়ী) উপাধি গ্রহণ করিয়া ঔরঙ্গজীব (২১শে জুলাই, ১৬৫৮) পিতার সিংহাসন অধিকার করেন। সম্রাট হইয়াই ঔরঙ্গজীব রাজ্য বিস্তারে মন দেন।

ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন, অহোম রাজকে পরাস্ত করেন এবং শ্রীহট্ট ও কোচবিহারের পূর্বাংশ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

ঔরঙ্গজীব ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। মুসলমান বলিয়া শিয়া সম্প্রদায় তাঁহার অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। মুসলমান ধর্মপ্রচারে তিনি উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার ও উপাধি

বিতরণের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার আদেশে হিন্দুদের উপর পুনরায় 'জিজিয়া' কর (মাথা পিছু কর) বসে। হিন্দুদের মেলা, উৎসব প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির বাদশাহের আদেশেই ধ্বংস করা হয়। সংখ্যায় গরিষ্ঠ প্রজাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানিয়া এইভাবে ঔরঙ্গজীব সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ডাকিয়া আনেন। যুগপৎ শিখ, মারাঠা ও রাজপুত শক্তির অভ্যুত্থান হয়। বিভিন্ন প্রদেশের শাসন-কর্তারা কার্যতঃ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাইতে সুরু করেন।



ঔরঙ্গজীব

ঔরঙ্গজীবের হিন্দুবিদ্বেষী নীতির ফলে ১৬৬৯ ও ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু জাঠরা বিদ্রোহ করে। বহু সৈন্যক্ষয় করিয়াও ঔরঙ্গজীব তাহাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারেন নাই। বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রসাল বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

শিখদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান

মহামতি আকবর শিখ সম্প্রদায়ের সহিত ভাল ব্যবহার করিয়া তাহাদের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শিখদের সহিত মুঘলদের বিরোধ বাধে। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন জহাঙ্গীরের আদেশে নিহত হন। ষষ্ঠ গুরু

হরগোবিন্দ শিখদের সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। ঔরঙ্গজীব নবম গুরু তেগ বাহাদুরকে হত্যা করিলে শিখরা দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় ও শিবাজী

এই সময় মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বড় বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায় মারাঠা জাতি। ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে মুঘলদের পরাজিত করিয়া মারাঠারা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এই দুইটি মুসলিম রাজ্য ধ্বংস করিয়া ঔরঙ্গজীব নিজের অজ্ঞাতেই শিবাজীর অভ্যুত্থানের পথ সুগম করিয়া দেন। ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দে শিবাজী 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে বাদশাহী ফৌজ সর্বত্র তাঁহার নিকট পরাজিত হয়।

মাড়বার-রাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার শিশু পুত্রকে মুসলমান করার জন্য ঔরঙ্গজীব চেষ্টা করেন। ইহাতে অনুগত রাজপুতরাও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মেবার-রাজ রাজসিংহের নেতৃত্বে রাজপুতরা বাদশাহী ফৌজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজীব মেবার ও মাড়বারের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

ঔরঙ্গজীবের ব্যক্তিগত জীবন আদর্শস্থানীয়। বিলাসব্যসনে তিনি কখনও নিমগ্ন থাকেন নাই। নিজে টুপী তৈয়ারী করিয়া তাহারই বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাঁহার কবরের খরচ নির্বাহের তিনি নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। বেশভূষায় তাঁহার কোনরূপ আড়ম্বর ছিল না। সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের মর্যাদার জন্য তিনি গীতবাদ্য নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

কর্মকুশল, পরিশ্রমী, সাহসী, চতুর, কূটনীতিবিদ ও দৃঢ়চরিত্র হইয়াও ঔরঙ্গজীব শাসক হিসাবে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ


হিন্দুকুশ পর্ব্বত
কাবুল
পেশোয়ার
কাশ্মীর
লাহোর
কান্দাহার
মুলতান
পানিপথ
দিল্লী
যমুনা
সিন্ধু নদ
আগ্রা
অযোধ্যা
হিমালয়
পর্ব্বতমালা
গঙ্গা
ব্রহ্মপুত্রনদ
আজমীর
রণথম্ভোর
এলাহাবাদ
চিতোর
মালব
কালিঞ্জর
বিহার
বঙ্গদেশ
উজ্জয়িনী
গুজরাট
নর্মদা
খান্দেশ
আসীরগড়
বেরার
গ
গোণ্ডোয়ানা
উড়িষ্যা
সুরাট
বোম্বাই
গোদাবরী
আহম্মদনগর
গোলকুণ্ডা
বেসিন
রায়গড়
বিদর
কৃষ্ণানদী
সাতারা
গোয়া
বিজাপুর
কালিকট
তাঞ্জোর
কোচিন
মাদুরা
সিংহল
মুঘল সাম্রাজ্য
আকবরের আমলে
ঔরঙ্গজীবের আমলে
সাম্রাজ্য বিস্তার

পরধর্মমতের প্রতি বিদ্বেষ, অন্যের প্রতি সর্বদা সন্দেহপ্রবণতা এবং র অভাব ঔরঙ্গজীবের অন্য সমস্ত গুণকেই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল।

মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ার কারণ

ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালেই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আকবর রাজনীতিবিদ্‌রূপে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া যে সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজীবের দূরদৃষ্টির অভাব সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করিল।

আকবর নিজের শক্তিকে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজার সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়া তিনি রাজপুত প্রভৃতি হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন হইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজীবের অনুদার ও হিন্দুদ্বেষী-নীতি হিন্দুদের মনে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং যে রাজপুতরা প্রথম হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের সমর্থক ছিলেন তাঁহারাই ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের অত্যধিক বিস্তার এবং যোগাযোগ রক্ষার অসুবিধা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের সহিত দূরবর্তী অঞ্চলের যোগ রক্ষা কঠিন ছিল, ফলে বিদ্রোহ ঘটিলে তৎক্ষণাৎ দমন করা সম্ভব হইত না।

মুঘল সৈন্যবাহিনী আকারে বিরাট ছিল। কিন্তু উহাকে জাতীয় বাহিনী বলা চলিত না। নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত এই বাহিনী সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা ছিল না। সৈন্যদের বাদশাহের প্রতি প্রত্যক্ষ আনুগত্য ছিল না, ফলে বিভিন্ন সেনাপতি বা নায়কদের ইচ্ছানুসারেই তাহারা চলিত। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে রাজধানীর সব কিছু থাকিত। সৈন্যবাহিনীকে একটি চলন্ত

বিশাল শহর বলিয়া মনে হইত। হাতী, ঘোড়া, লোক-লস্কর, বিলাসব্যসনের সর্ববিধ উপকরণ-সমন্বিত কোন বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে দ্রুত আক্রমণ বা কৌশল প্রদর্শনের সম্ভাবনা ছিল না। সামরিক শক্তি এইভাবে হ্রাস পাওয়া মুঘল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ।

ধ্বংসোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার খবর ভারতের বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া একটি অছিলায় পারস্যের রাজা নাদির শাহ্‌ ১৭৩৮ খ্রীঃ অব্দে ভারত অভিযান করেন। দিল্লীর সিংহাসনে আসীন মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন। বিজেতা ও বিজিত উভয়েই দিল্লী প্রবেশ করার পর নাদির শাহের মৃত্যুর গুজবে কিছু হাঙ্গামা হয়। নিজের কয়েকজন নিহত সৈন্যকে দেখিয়া নাদির শাহ্‌ দিল্লীবাসীদের হত্যা করিতে আদেশ দেন। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে হাজার হাজার নরনারী নিহত হয়। বিপুল ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করিয়া নাদির শাহ্‌ পারস্যে ফিরিয়া যান। এই আঘাতে মুঘল সাম্রাজ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে।

শেরশাহের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতে সম্রাট আকবর যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন মুঘল যুগে অন্যান্য সম্রাটের আমলে তাহাই চালু থাকে। মুঘল যুগের শাসন ব্যবস্থার কিছু কিছু অবশেষ বৃটিশ আমল হইতে আজিকার স্বাধীন ভারতেও রহিয়া গিয়াছে।

মুঘল যুগে শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা

মুঘল আমলে সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি 'সুবা' অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এ ব্যবস্থা আজও বহাল রহিয়াছে; শুধু প্রদেশগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে গঠনের দাবি উঠিয়াছে।

আকবর প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থা বৃটিশ আমলেও অনেকাংশে বহাল

ছিল এবং আজও কিছুটা আছে। মুঘল আমলে রাজস্বকে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় বা প্রাদেশিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। কেন্দ্রের রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব, শুল্ক, টাঁকশাল উত্তরাধিকার কর, ইত্যাদি। প্রাদেশিক বা স্থানীয় রাজস্বের উৎস ছিল প্রধানতঃ পরিবহন, উৎপাদন, ব্যবসাবাণিজ্য ও পেশার উপর কর।

তখনকার দিনে ভূমিরাজস্বই ছিল সরকারী রাজস্বের প্রধান উৎস। রাজা তোডরমল এই ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সমগ্র সাম্রাজ্য জরিপ করাইয়া উর্বরতা ও কৃষির ব্যবস্থা অনুযায়ী জমির শ্রেণীবিভাগ করা হয় ; এবং তদনুসারে প্রত্যেক জমির রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়। কৃষকগণ অর্থের দ্বারা অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ ফসলের দ্বারা রাজকর দিত। জমি জরিপ করিয়া রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা আজও চালু আছে।

মুঘল আমলে সুবা বা প্রদেশের শাসনকর্তার নাম ছিল প্রথমে 'নাজিম' বা 'সিপাহ্-সলার', পরে 'সুবাদার'। সুবাগুলি 'সরকার' বা জিলায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক 'সরকার' বা জিলার শাসকের উপাধি ছিল 'ফৌজদার'। শহর রক্ষার ভার থাকিত 'কোতোয়াল' উপাধিধারী কর্মচারীদের উপর। 'কাজী' উপাধিধারী ব্যক্তিদের উপর বিচারের ভার ছিল।

আজিকার দিনে গভর্নর বা রাজ্যপাল, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদগুলির সহিত মুঘল আমলের উল্লিখিত পদগুলির অনেক মিল আছে। শহরের সদর দপ্তরের থানাকে আজও কোতোয়ালী থানা বলা হয়। অবশ্য, মিল কিছু কিছু থাকিলেও আজিকার দিনে আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থার সহিত মুঘল আমলের শাসনব্যবস্থারও পার্থক্য আছে অনেক।

আজিকার দিনে ভারতের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক, জনসাধারণের প্রতি বর্তমান সরকারের বহুবিধ কর্তব্য রহিয়াছে। আজকাল লিখিত আইন ও সংবিধানের দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়।

মুঘল যুগ ও বর্তমান যুগ—মিল ও পার্থক্য

মুঘল যুগে সরকার ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। বাদশাহই ছিলেন সর্বময় কর্তা—একাধারে সম্রাট, সেনাপতি বিচারক ও ধর্মমীমাংসক। সে যুগে সামরিক শক্তিই ছিল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ এবং এই কারণেই শাসনকর্তারা ছিলেন যুগপৎ সামরিক কর্মচারী এবং বাদশাহের প্রতিনিধি। মন্ত্রীদের পরামর্শ সম্রাট লইতেও পারিতেন, নাও লইতে পারিতেন। তবে মুঘল সম্রাটরা বিচক্ষণ মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া সাধারণতঃ কাজ করিতেন না। সংবিধান বলিয়া সে যুগে কিছু ছিল না, বিচার ব্যবস্থাতেও বহু গলদ ছিল।

সম্রাট সর্বময় কর্তা হইলেও তখনকার দিনে বিরাট সাম্রাজ্যের সর্বত্র সর্বময় কর্তৃত্ব খাটানো সম্ভব হইত না। ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কার্যতঃ স্বায়ত্তশাসনাধিকার ভোগ করিতেন। ভারতে তৎকালীন ইংরাজদের কারখানাসমূহের নথিপত্রে দেখা যায় যে, শাহ্‌জহান ও ঔরঙ্গজীবের আমলেও সুবাদার, দেওয়ান প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের বিরোধী কাজ করিতেন।

পল্লী অঞ্চলে অপরাধ নিবারণ ইত্যাদির জন্য মুঘলরা নূতন কোন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন নাই। যুগ যুগ ধরিয়া গ্রামের প্রধান বা মোড়ল এবং তাহার অধীন চৌকিদাররা যে ভাবে শান্তিরক্ষা করিয়া আসিতেছিল মুঘল যুগেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহার ফলে গ্রামের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া গিয়াছিল।

আজিকার দিনে প্রদেশ হইতে গ্রাম পর্যন্ত একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও

সুনিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেণ্টের অধীনে শাসিত হইতেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, সরকারী প্রত্যেক দপ্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ এবং গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি কোনও সরকারী কর্মচারী বা দপ্তরকে ইচ্ছামত চলিবার সুযোগ দেয় না। লিখিতভাবে আইন বা সংবিধানে যতটুকু অধিকার দেওয়া হয় তাহাই কোন প্রদেশ বা সরকারী দপ্তর বা কর্মচারী ভোগ করিতে পারেন।

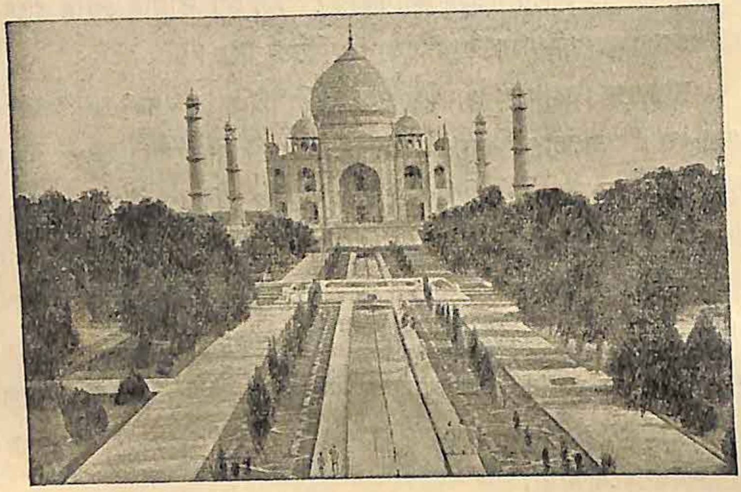
আকবরের আমলে জায়গীর প্রথা তুলিয়া দিয়া 'মন্‌সব' প্রথা প্রবর্তন করা হয়। প্রত্যেক মন্‌সবদার নির্দিষ্ট হারে রাজকোষ হইতে বেতন পাইতেন এবং তাঁহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য রাখিতে হইত। সম্রাট মন্‌সবদারের সরাসরি নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতেন। জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র যাহাতে কলুষিত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অর্থাৎ পয়গম্বর মহম্মদের অনুশাসন এবং নীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি যাহাতে কার্যকরী হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য 'মুহ্‌তাসিব' উপাধিধারী একদল কর্মচারী ছিলেন। 'মন্‌সবদার' বা 'মুহ্‌তাসিব' ধরণের কোন পদ আজিকার দিনে নাই।

মুঘল যুগের মহৎ কীর্তি

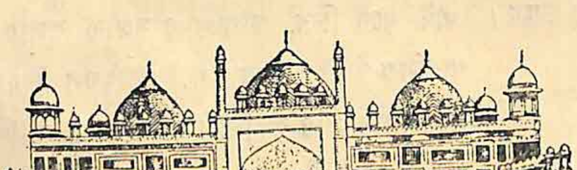
মুঘল যুগের মহৎ কীর্তি হইল হিন্দু ও মুসলমানের এক সম্মিলিত সংস্কৃতির উদ্ভব। এই যুগে চিত্র, স্থাপত্য ও সঙ্গীত কলায় হিন্দু ও পারসিক রীতির সমন্বয় ঘটে। মুঘল চিত্রকলা এবং অমর গায়ক ও সুরশিল্পী তানসেনের আবির্ভাব এই অপূর্ব সমন্বয়ের পরিণতি।

স্থাপত্যশিল্পে এ যুগে ভারত যে গৌরবের অধিকারী হয় তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। আগ্রার কেল্লা, ফতেপুর সিক্রি, সিকান্দ্‌রা, তাজমহল, দিল্লীর কেল্লা, দিল্লীর জমা মসজিদ, দেওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি হিন্দু-পারসিক স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

হিন্দু ও মুসলমানের প্রতিভার অপূর্ব সমন্বয় তৎকালীন সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। হিন্দি

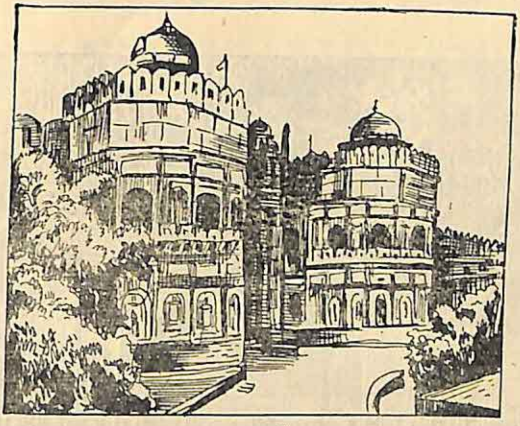


তাজমহল

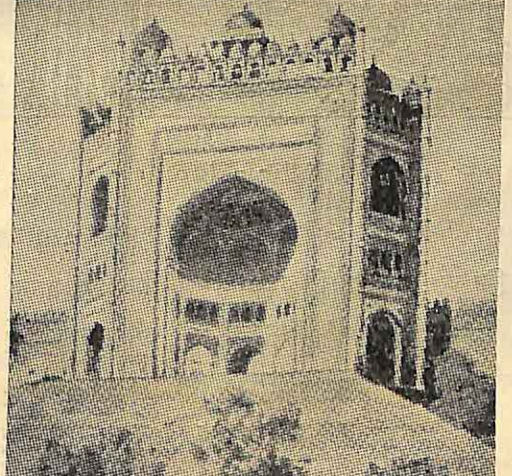


জমা মসজিদ

সাহিত্যে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' ও সুরদাসের 'সুর সাগর', বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' প্রভৃতি এই যুগেরই রচনা। মারাঠী সাহিত্যে রামদাস, তুকারাম, শেখ মুহম্মদ,

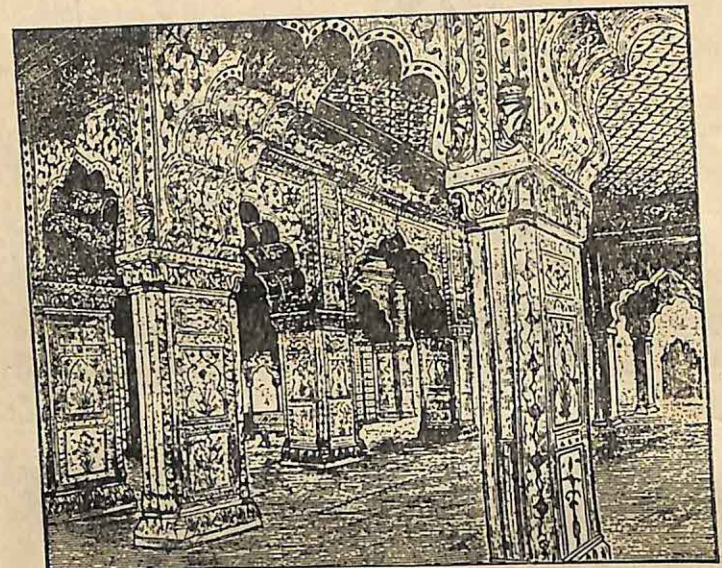


আগ্রার দুর্গ



বুলন্দ দরওয়াজা

বাংলা সাহিত্যে 'পদ্মাবতী' রচয়িতা আলওয়াল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, হিন্দি 'পদ্মাবতী'-রচয়িতা মুহম্মদ জয়সী প্রভৃতির আবির্ভাব



দেওয়ান-ই-খাস

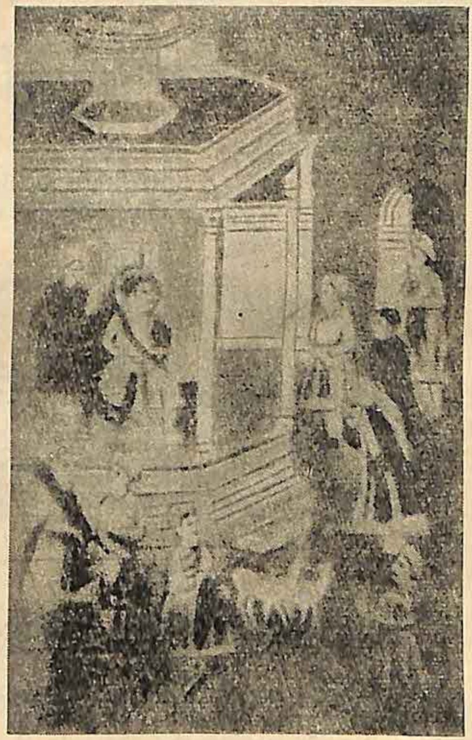
এই যুগেই হয়। বহু হিন্দু এই সময় ফার্সী ভাষায় এবং বহু মুসলমান এই সময় হিন্দি অথবা প্রাদেশিক ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেন।

সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসে ও জীবনযাত্রায় এই যুগে ধর্মীয় সহনশীলতা ও উদারতা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী ও পর্যটকের আগমন

মুঘল যুগের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে ভারতে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের উপস্থিতি। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের দূতরূপে স্যার টমাস রো জহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে বাদশাহের দরবারে

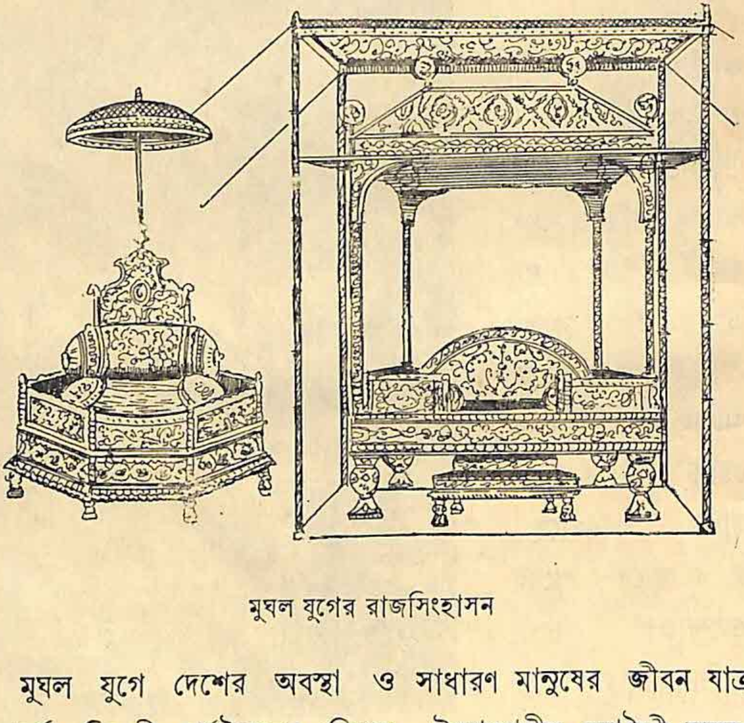
উপস্থিত হন। ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৬১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত তিনি বাদশাহের দরবারে অবস্থান করেন। স্যার টমাস রো-এর দৌত্য সফল হইয়াছিল। তিনি সাম্রাজ্যের কয়েকটি স্থানে ইংরাজদের কারখানা স্থাপনের অধিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সুবিধা আদায় করিতে সমর্থ হন। তিনি যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন ইংরাজরা সুরাট, আগ্রা, আমেদাবাদ ও ব্রোচে কারখানা স্থাপন করিয়াছে। ইংরাজদের পূর্বেই ওলন্দাজরা চুঁচড়া, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে কারখানা স্থাপন করিয়াছিল। ১৬৬৮ খ্রীঃ অব্দে ফরাসীরা ভারতে প্রথম কারখানা স্থাপন করে।



সম্রাট জহাঙ্গীরের দরবারে স্যার টমাস রো-এর দৌত্য

মুঘল যুগে এশিয়া ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্য বেশ বড় আকারেই চলিত। প্রধানতঃ সোনারূপার থান, ঘোড়া, নানারূপ ধাতু, গজদন্ত, ভেলভেট, গন্ধদ্রব্যাদি, ঔষধপত্র,

মূল্যবান প্রস্তর, চীনা মাটির বাসন, কাফ্রী ক্রীতদাস প্রভৃতি ভারত আমদানি করিত। ভারত রপ্তানী করিত, প্রধানতঃ বিবিধ প্রকার বস্ত্রাদি, নীল, অহিফেন, মরিচ, ঔষধাদি। সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে, বেসিন, গোয়া, কালিকট, কোচীন, মসলীপত্তম, চট্টগ্রাম, সোনার গাঁ প্রভৃতি প্রধান বন্দর ছিল।



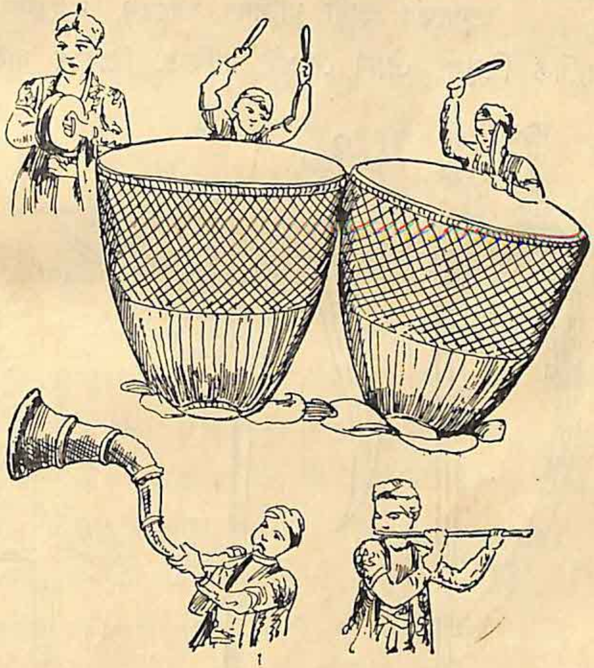
মুঘল যুগের রাজসিংহাসন

মুঘল যুগে দেশের অবস্থা ও সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, ইয়োরোপীয় ফ্যাক্টরী সমূহের নথিপত্র, বাবর ও জহাঙ্গীরের আত্মচরিত, আইন-ই-আকবরী প্রভৃতি হইতে প্রভূত তথ্য জানিতে পারা যায়।

স্যার টমাস রো-এর বর্ণনায় দেখা যায় যে বাদশাহ দিনে তিনবার

দরবার করিতেন ; দ্বিপ্রহরে হস্তী ও অন্যান্য জন্তুর খেলা দেখিতেন ; অপরাহ্নে বেলা চারিটা হইতে পাঁচটা ছয়টা পর্যন্ত প্রার্থীদের সহিত দেক্ষা সাক্ষাৎ করিতেন। রাত্রি নয়টা হইতে দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত তিনি রাজ্যের গণ্যমান্য লোকদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন। সপ্তাহে একদিন বাদশাহ নিজে বিচারে বসিতেন। এই বিবরণ বাদশাহ জহাঙ্গীরের দরবারের বিবরণ, কিন্তু মুঘল সম্রাটেরা মোটামুটি এইভাবেই রাজ-

মুঘল দরবার

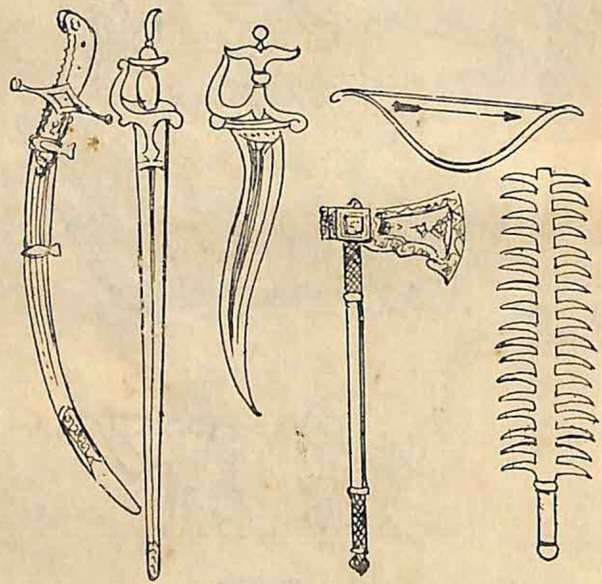


মুঘল যুগের বাদ্যযন্ত্রাদি

কার্য চালাইতেন। বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁহাদের পদমর্যাদা অনুসারে দরবারে স্থান পাইতেন।

বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া মন্‌সবদারদের জীবন ছিল বিলাসব্যসনে পূর্ণ। ধনীদের ঐশ্বর্যের অভাব হইত না। মাত্রা ছাড়াইয়া তাঁহারা আমোদ আহ্লাদ করিতেন, নবাবীর চূড়ান্ত করিতেন। তবে এই যুগে বাদশাহ ও আমীর ওমরাহদের অনেকেই বিদেশাগত হইলেও সকলেই ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হইতেন, কাজেই বিলাস ব্যসনে ব্যয়িত বিপুল ঐশ্বর্য দেশেই থাকিত, বিদেশে যাইত না।

মুঘল যুগে দেশের অবস্থা



মুঘল যুগের কয়েকপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র

কামান বন্দুক ছাড়াও বহুবিধ অস্ত্র মুঘল যুগে ব্যবহৃত হইত

ভারতের বিরাট বিরাট সমৃদ্ধিশালী শহর দেখিয়া বিদেশীরা স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন।

মধ্যবিত্ত ও বণিক শ্রেণী সাধারণতঃ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। সাধারণ প্রজা ও কৃষকরা অনেক সময় উৎপীড়িত হইত এবং শ্রমিকদেরও জোর জবরদস্তি করিয়া সামান্য মজুরী দেওয়া হইত। রাজ্যের পদস্থ কর্মচারী ও অভিজাত ব্যক্তিরা প্রায়ই অর্ধমূল্যে জিনিসপত্র ক্রয় করিতেন। তবে সাধারণ মানুষের অবস্থা আজিকার যুগ হইতে খুব খারাপ ছিল না। কারণ তখন খাদ্যাদির অভাব ছিল না এবং দামও খুব কম ছিল। সাধারণ মানুষের আয় কম হইলেও জীবিকা নির্বাহে খুব কষ্ট পাইতে হইত না। স্মিথ লিখিয়াছেন যে, 'আকবর ও জহাঙ্গীরের সময় ভাড়া-করা জমিহীন মজুররা সম্ভবতঃ আজিকার দিন অপেক্ষা বেশীই খাইতে পাইত।'

ভারত বস্ত্রশিল্পে এই যুগে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঢাকার মসলিন জগদ্বিখ্যাত ছিল। বের্ণিয়ার নামক একজন ফরাসী চিকিৎসক বার বৎসর (১৬৫৬-৬৮) এদেশে ছিলেন। তিনি বলেন যে বাংলাদেশের তূলা ও রেশম শিল্প শুধু হিন্দুস্থান নহে সমস্ত প্রতিবেশী দেশ এবং ইয়োরোপের অভাব মিটাইত। বাংলাদেশের চাউল ও চিনি অনেক দেশে রপ্তানী হইত। অন্যান্য বহু শিল্পেও এযুগে ভারত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

রাস্তাঘাট, নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং নদী পথে চলাচল ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত এবং মানুষ মানুষের মাংস খাইত এরূপ বর্ণনাও বদাউনী প্রভৃতির রচনায় পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা তখন ছিল না, ফলে অনাবৃষ্টি হইলে কৃষকদের দুর্গতির অন্ত থাকিত না। আকবর ও শাহ্‌জহান কিছু কিছু সাহায্য দিয়া বা লঙ্গরখানা খুলিয়া

দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু তাহা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

মোটের উপর মুঘল যুগের যে চিত্র বিদেশী পর্যটকদের বিভিন্ন বিবরণ সমসাময়িক সাহিত্য, বাদশাহদের আত্মচরিত ইত্যাদি হইতে পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় ভারতের অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় কিছু খারাপ ছিল না, বরং ভালই ছিল। ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে মুঘল যুগে যে অবস্থার বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়, জগতের সর্বত্রই সেইরূপ অবস্থাবৈষম্য সে যুগে লক্ষিত হইত।

অনুশীলনী

১। ভারতে মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। শেরশাহের রাজত্বকাল স্বল্পস্থায়ী হইলেও উল্লেখযোগ্য। কেন?

৩। 'আকবরের মত নরপতি ইতিহাসে বিরল'—ব্যাখ্যা কর।

৪। "কর্মকুশল, পরিশ্রমী, সাহসী, চতুর, কূটনীতিবিদ ও দৃঢ় চরিত্র হইয়াও ঔরঙ্গজীব শাসক হিসাবে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দেন"—বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

৫। মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কারণগুলি বর্ণনা কর।

৬। মুঘল যুগের মহৎ কীর্তি কি?

৭। মুঘল যুগ ও বর্তমান যুগে ভারতের শাসনব্যবস্থায় কোথায় কোথায় সাদৃশ্য ও পার্থক্য আছে দেখাও।

৮। মুঘল যুগে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৯। স্যার টমাস রো কে ছিলেন? তাঁহার বর্ণিত মুঘল দরবারের একটি চিত্র দাও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে বিপ্লব

ইংল্যাণ্ডের বড় বড় জায়গীরদারদের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া যে লড়াই চলে, তাহাকে বলা হইয়াছে সাদা ও লাল গোলাপের যুদ্ধ (Wars of the Roses)।* ইহার ফলে সেখানে সামন্ত-তন্ত্র একেবারে দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং সমগ্র জাতির, বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ী শ্রেণীর সমর্থনে রাজতন্ত্র জাঁকিয়া বসে। ইংল্যাণ্ডে এই সময় টিউডর রাজবংশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ এক জন ক্ষমতাশালী রাজার প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভব করিয়াছিল, তাই সপ্তম হেনরীকে রাজপদে বসাইতে এবং তাঁহাকে অবাধ ক্ষমতা দিতে তাহারা দ্বিধা করে নাই।

টিউডর বংশের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডে নানা দিকে বিপুল পরিবর্তন হইল। রেনেসাঁসের ঢেউ ইংল্যাণ্ডেও লাগিয়াছিল। ধর্মের নামে যে সকল অনাচার চলিতেছিল তাহার বিরুদ্ধে চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তিরা তীব্র সমালোচনা করিতে আর ভয় পাইতে ছিলেন না। ইতিমধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপার লইয়া রাজা অষ্টম হেনরীর সহিত পোপের বিরোধ ঘটিল। এই বিরোধের পরিণতি ঘটিল পোপের আধিপত্যের অবসানে। ইহার পর ক্রমে প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ ইংল্যাণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রোটেস্ট্যাণ্ট জগতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইংল্যাণ্ড রোমান কাথলিক জগতের নেতা স্পেনের আধিপত্যের অবসান ঘটাইল। এই ভাবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের

* দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের প্রতীক ছিল সাদা এবং লাল গোলাপ।

মধ্য দিয়া ইংল্যাণ্ড শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের জন্য টিউডর রাজবংশ ইংল্যাণ্ডে সামন্তবর্গের সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং দুর্নীতি দমনের অজুহাতে সন্ন্যাসী-সংঘের মঠ-মন্দিরগুলি তুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তাহা কঠোর হস্তে দমন করা হয় এবং প্রধান প্রধান মঠগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। রাজা মঠগুলির সম্পত্তির কিয়দংশ খাসে রাখিয়া বাকী সমস্ত সম্পত্তি প্রধান অনুচর ও প্রিয়পাত্রদের মধ্যে বিলাইয়া দেন। ইংল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত অনেক পরিবার এই সকল সম্পত্তি পায় এবং ক্রমে এইভাবে ইংল্যাণ্ডে এক শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়।

টিউডর রাজবংশ নৌ-শক্তি সম্প্রসারণের উপর খুব জোর দেন। জলদস্যুরূপে যাহারা এই সময় স্পেনের বাণিজ্যপোত প্রভৃতি লুণ্ঠন করিত তাহারা জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করে।

জন হকিন্স নামক এক ব্যক্তি এই যুগে প্রথম আফ্রিকা হইতে নিগ্রোদের বন্দী করিয়া আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিয়া অর্থার্জনের এবং বাণিজ্য বিস্তারের এক কলঙ্ককর নূতন অধ্যায় রচনা করে। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের (East Indies) পথ উন্মুক্ত করেন। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চ্যান্সেলার নামক একজন ইংরাজ নাবিক আর্কেঞ্জল হইয়া মস্কোয় উপস্থিত হয়। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর রাণী এলিজাবেথ লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দিয়া এক সনদ প্রদান করেন। ইহার ফলে ইংল্যাণ্ডের বহির্বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ঘটে এবং দেশের ধনসম্পদ অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায়। বহির্বাণিজ্যের

প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যও প্রসার লাভ করে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

টিউডর আমলে ইংল্যাণ্ডের যে উন্নতি হয় তাহার মূলে ছিল ব্যবসায়ী, বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইহারাই ছিল সমাজের উদীয়মান শক্তি। টিউডর রাজবংশের বিপুল শক্তি ইহাদেরই সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই ক্রমে ইহারা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। রাজা ও অভিজাত শ্রেণীর হাত হইতে দেশের শাসন-ভার লইবার আকাঙ্ক্ষা এই সকল শ্রেণীর মধ্যে ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। টিউডর রাজবংশ এই সকল শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে কাজ করায় রাজার অবাধ ক্ষমতার বিরুদ্ধে ইহারা কোন কথা বলে নাই। বিশেষ করিয়া রাণী এলিজাবেথ সুনিপুণ হস্তে রাজশক্তি পরিচালনা করিয়া ইংল্যাণ্ডের মর্যাদা এবং শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করায় বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। রাণী এলিজাবেথের পর স্টুয়ার্ট রাজবংশ ইংল্যাণ্ডের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে বিরোধ বাধে এবং দীর্ঘ বিরোধের পরিণতি ঘটে প্রজাশক্তির জয়ে—ইহাই সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব বলিয়া অভিহিত হয়।

নূতন শক্তির অভ্যুদয়

রাণী এলিজাবেথ আজীবন অবিবাহিতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নিকটতম জ্ঞাতি স্কটল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেম্‌স ইংল্যাণ্ডের রাজপদে বৃত হ'ন। প্রথম জেম্‌স নামে ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজপদে অভিষিক্ত হন। এইভাবে স্টুয়ার্ট রাজবংশের শাসন সুরু হয়।

বিরোধের সূত্রপাত

স্টুয়ার্টরা ছিলেন বিদেশী, রক্ষণশীল এবং ব্যবহারিক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। ইংল্যাণ্ডে যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল বা ঘটিতেছিল সেগুলি উপেক্ষা

করিয়া তাঁহারা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বজায় রাখার চেষ্টা করিলেন, ফলে বিরোধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। পার্লামেণ্টের সহিত রাজাদের বিরাট সংগ্রামের সূচনা হইল।

রাজা প্রথম জেম্‌স নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং রাজনীতির চর্চা করিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সুতরাং রাজ্যশাসনে রাজারই চরম অধিকার—প্রজার নহে। প্রজারা বা পার্লামেণ্ট যে সকল অধিকার পাইয়াছেন সেগুলি রাজার দয়ার দান, ইচ্ছা করিলেই রাজা তাহা ফিরাইয়া লইতে পারেন। এই মতবাদের নাম হইল 'ঈশ্বরদত্ত অধিকার' (Divine Right).



প্রথম জেম্‌স

টিউডর যুগের পূর্বেই পার্লামেণ্ট প্রজা-শক্তির প্রতিনিধিরূপে কর ধার্যের ব্যাপারে প্রজার সম্মতি গ্রহণ, আইন প্রণয়ন, যথারীতি বিচার ব্যতীত কাহারও শাস্তি বিধান না করা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার লাভ করিয়াছিল। প্রথম জেম্‌স এই সকল অধিকার মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না।

প্রথম জেম্‌স ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে পার্লামেণ্টের উদ্বোধন করিয়াই গডউইন নামক একজন নির্বাচিত সদস্যের নির্বাচন বাতিল করিয়া দিলেন। পার্লামেণ্ট এই কাজ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিল। শেষ পর্যন্ত জেম্‌সকে পার্লামেণ্টের হাতেই গডউইন নির্বাচন সমস্যার ভার ছাড়িয়া দিতে হইল।

জেম্‌স পার্লামেণ্টের মত না লইয়াই কয়েকটি আমদানি মালের উপর শুল্ক বসাইলেন। আদালত ইহা সমর্থন করায় পার্লামেণ্ট আদালতের রায় ও কর ধার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল। জেম্‌স

ক্রুদ্ধ হইয়া পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন। বিচারপতি কোকের রায় পার্লামেণ্টের অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও রাজা জেম্স আরও দুইবার পার্লামেণ্ট আহ্বান করিয়া পরে ভাঙ্গিয়া দেন। স্টুয়ার্ট রাজারা প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতকে সুনজরে দেখেন নাই। প্রথম জেম্স-এর আমলে পিউরিট্যান বা শুচিবাদী সম্প্রদায়ের উপর রীতিমত অত্যাচার সুরু হয়, ফলে বহু শুচিবাদী হল্যাণ্ড ও আমেরিকায় পলায়ন করে। রাজা জেম্স-এর আমল হইতেই রাজা-প্রজার বিরোধ বেশ প্রবল আকার ধারণ করে।

প্রথম জেম্স-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম চার্লস ইংল্যাণ্ডের রাজা হন। পিতার রাজত্বকালেই ইংল্যাণ্ড ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে (১৬১৮-১৬৪৮) যোগ দিয়াছিল। কাজেই সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই চার্লসের বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। পার্লামেণ্ট মাত্র এক বৎসরের 'টনেজ' ও 'পাউণ্ডেজ' নামে কর মঞ্জুর করে। পূর্বে এই ধরণের কর রাজার যাবজ্জীবনের জন্য মঞ্জুর করা হইত। কাজেই চার্লস অসন্তুষ্ট হইলেন। ইহার পর তাঁহার মন্ত্রণাদাতা বাকিংহামের ডিউককে লইয়া গোলোযোগ বাধিল। বাকিংহাম রাজাকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকেন। এই সন্দেহে পার্লামেণ্ট তাঁহার পদচ্যুতি এবং পরে তাঁহাকে অভিযুক্ত করার দাবী জানায়। চার্লস ক্ষিপ্ত হইয়া দুইবার পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেন। বাকিংহামের পরামর্শে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া রাজা চার্লস তাঁহারই পরামর্শে বাধ্যতামূলক ঋণ আদায় সুরু করিলেন। এইভাবে পার্লামেণ্টের মতামত না লইয়াই কর ও ঋণ আদায় করা হইতে লাগিল। তখন স্যার জন ইলিয়াট, হ্যাম্পডেন, পীম ও স্যার টমাস ওয়েণ্ট


প্রথম চার্লস (১৬২৫-৪৯)

ওয়ার্থ এই চারিজন সদস্যের নেতৃত্বে পার্লামেণ্টের পক্ষ হইতে রাজার নিকট এক আবেদনপত্র দাখিল করা হইল (১৬২৮)। ইহাই বিখ্যাত স্বাধিকার পত্র (Petition of Right). ইহার চারিটি সর্ত ছিল; যথা—(১) পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা কোনরূপ কর আদায় করিতে বা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। (২) উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন না। (৩) কখনও গৃহস্থদের ঘরে সৈন্যদিগকে বাস করিতে দেওয়া হইবে না। (৪) যুদ্ধের সময় ব্যতীত কখনও সামরিক আইনের বলে দেশ-শাসন করা চলিবে না।

স্বাধিকার পত্র

নিরুপায় হইয়া রাজা চার্লস এই স্বাধিকার পত্র মানিয়া লইলেও কার্যক্ষেত্রে তিনি অধিকারগুলি অগ্রাহ্য করিতে থাকেন। পার্লামেণ্টে ইহার তীব্র সমালোচনা হইলে তিনি পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেন এবং নেতাদের কারারুদ্ধ করেন। দশ বৎসরের মধ্যে চার্লস আর পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন নাই। এই দশ বৎসরকে স্বৈরশাসনের যুগ বলা হয়।

অর্থাভাবে বাধ্য হইয়া দশ বৎসর পরে চার্লসকে পুনরায় পার্লামেণ্ট আহ্বান করিতে হয়। মাত্র তিন সপ্তাহ এই পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়। এই কারণে ইহার নাম 'স্বল্পকাল স্থায়ী পার্লামেণ্ট' (Short Parliament). পার্লামেণ্ট যুদ্ধের জন্য অর্থ মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত চার্লসকে নিরুপায় হইয়া আবার পার্লামেণ্ট আহ্বান করিতে হয়। এই পার্লামেণ্টের নাম 'দীর্ঘকাল স্থায়ী পার্লামেণ্ট' (Long Parliament)। এই পার্লামেণ্ট ২০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে চার্লসের সহিত পার্লামেণ্টের বিরোধ চরমে উঠে এবং গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

দীর্ঘকাল স্থায়ী পার্লামেণ্ট (১৬৪০-৬০)

পার্লামেণ্ট রাজার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া নিজের হাতে সৈন্যদলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলে ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দের ২২শে আগস্ট চার্লস যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে মোটের উপর অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশই রাজার পক্ষে এবং ব্যবসায়ী ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী পার্লামেণ্টের পক্ষে যোগ দেন।

প্রধানতঃ অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বেই পার্লামেণ্ট-পক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ক্রমওয়েল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তিনি ছিলেন পিউরিট্যান বা শুচিবাদী। তাঁহার সরল জীবনযাত্রা, ধর্মমতে নিষ্ঠা, গণতন্ত্র প্রীতি ও প্রবল ব্যক্তিত্ব জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গণতন্ত্রকামী নরমপন্থী ও চরমপন্থী সকল দল ও মতের মানুষ ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে রাজার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দীর্ঘকাল পার্লামেণ্টের সদস্য থাকায় পার্লামেণ্টেও ক্রমওয়েলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁহার প্রচেষ্টায় সংগঠিত ও শিক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনীই রাজকীয় বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। বহু রক্তক্ষয় ও কূটনীতির খেলার পর রাজা চার্লস আত্মসমর্পন করিলেন। দেশদ্রোহের অভিযোগে ১৩৫ জন লোক লইয়া গঠিত এক বিচার সভার (ট্রাইব্যুনাল) বিচারে রাজার প্রাণদণ্ড হইল।

অলিভার ক্রমওয়েল (১৫৯৯-১৬৫৮)

চার্লসের প্রাণদণ্ড

১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী বিচার সভায় রায় ঘোষিত হয়। ঐ দিনই বেলা ২টার সময় চার্লসকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। চার্লস সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করিয়া যে শেষ বক্তৃতা দেন তাহাতেও তিনি বলেন রাজ্যশাসনে জনসাধারণের অংশগ্রহণের কোন অধিকার নাই। নিজেকে নিরপরাধ বলিয়া ঘোষণার

পর তিনি জল্লাদের কুঠারের নীচে মাথা পাতিয়া দেন। রাজার শিরচ্ছেদ করিয়া জল্লাদ ছিন্ন মুণ্ড তুলিয়া বলে—'বিশ্বাসঘাতকের মুণ্ড দেখ'।



ক্রমওয়েল

রাজা চার্লসকে মৃতুদণ্ড দিবার ইচ্ছা কাহারও ছিল না। ক্রমওয়েল পর্যন্ত তাঁহার সহিত আপোষের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চার্লসের দুরভিসন্ধিপূর্ণ কূটনীতিতে বিরক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত পার্লামেণ্টরী পক্ষকে চরমপন্থা অবলম্বন করিতে হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে ক্রমওয়েল ও আয়ারটনই বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

ইংল্যাণ্ডে প্রজাতন্ত্র

রাজা চার্লসের মৃত্যুর পর ইংল্যাণ্ডে প্রজাতন্ত্র (কমনওয়েলথ) ঘোষিত হয় এবং ৪১ জন সদস্য লইয়া একটি রাষ্ট্র পরিষদ (Council of State) গঠিত হয়। ক্রমওয়েলই কার্যতঃ ইংল্যাণ্ডের শাসক হইলেন। রাজা প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া আয়র্ল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড বিদ্রোহ করিলে ক্রমওয়েল কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন। ১৬৫৩ খ্রীঃ অব্দে ক্রমওয়েল রাষ্ট্রের অধিরক্ষক (Protector) বলিয়া ঘোষিত হন। দশ বৎসর দেশ শাসনের পর ১৬৫৮খ্রীঃ অব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর ক্রমওয়েলের মৃত্যু হয়।

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রিচার্ড অধিরক্ষক পদ লাভ করেন। কিন্তু শাসন কার্য চালাইতে না পারিয়া দশ মাস পরেই তিনি

পদত্যাগ করেন। ইহার ফলে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হইয়া উঠে। প্রথম চার্লসের সুচতুর পুত্র দ্বিতীয় চার্লস এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন। একটি সম্মেলনে (১৬৬০) রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রজাতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা



দ্বিতীয় চার্লস

জনমতের সরাসরি বিরোধিতা না করিয়া দ্বিতীয় চার্লস কৌশলে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং রাজশক্তিও আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় জেম্‌স (১৬৮৫-৮৮) সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় জেম্‌স ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। কৌশল করিয়া কিছু করার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। ক্যাথলিক ধর্মমতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র স্থাপনই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, ফলে আবার রাজা-প্রজার বিরোধ ঘনাইয়া উঠে। এই সময় মনমাউথের ডিউক বিদ্রোহ করিলে চরমপন্থী গণতন্ত্রী ও নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষ তাঁহাকে সমর্থন করে। চরমপন্থীদের জয়লাভের আশঙ্কায় বণিক্, ভূম্যধিকারী প্রভৃতি সমাজের গণ্যমান্য শ্রেণীর লোকেরা এই বিদ্রোহ দমনে রাজা দ্বিতীয় জেমস্‌কে সাহায্য করেন। ইহার ফলে জেমস্-এর দাপট আরও বাড়িয়া যায়।

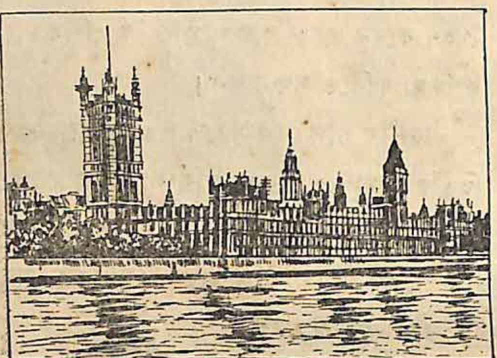


দ্বিতীয় জেম্‌স

জেমস্-এর স্বেচ্ছাচারী শাসনে বিরক্ত জনসাধারণ জেমস্-এর প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতাবলম্বী জামাতা অরেঞ্জের (হল্যাণ্ড) উইলিয়ামকে রাজপদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণ পত্রে দেশের

সকল দলের নেতৃস্থানীয় সমস্ত লোক স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দে ৫ই নভেম্বর উইলিয়াম সসৈন্যে ইংল্যাণ্ডের উপকূলে অবতরণ করেন। কাহারও সহায়তা না পাইয়া জেম্‌স ফ্রান্সে পলায়ন করেন। বিনা রক্তপাতে এইভাবে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় এবং চূড়ান্তভাবে রাজার স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে জয় ঘটায় এই বিপ্লবকে 'গৌরবময় বিপ্লব' বলা হয়।

গৌরবময় বিপ্লব ১৬৮৮)


পার্লামেণ্ট ভবন

এতদিন রাজা-প্রজায় যে সকল বিষয় লইয়া বিরোধ চলিতেছিল স্বাধিকার সনদের ভিত্তিতে স্বাধিকার ঘোষণা (Bill of Rights) নামে ঘোষণাপত্র পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় সেই সকল বিষয় সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা হইয়া যায়।

এই সময় হইতে ইংল্যাণ্ডে রাজার স্বৈর শাসনের অবসান হয় এবং প্রকৃত শাসনের সর্বময় ক্ষমতা ক্রমশঃ পার্লামেণ্টের হাতে যাইতে থাকে।

অনুশীলনী

১। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের বিপ্লবের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

২। "টিউডর আমলে ইংল্যাণ্ডে এক শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল"—ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাও।

৩। স্টুয়ার্ট রাজাদের সহিত পার্লামেণ্টের বিরোধের কারণ কি?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্তি

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধ বাধিল। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য তখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, রাজশক্তি দৃঢ় হস্তে ধারণ করিবার মত কেহ নাই, সর্বত্র দেখা দিয়াছে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। সঙ্গে সঙ্গে তখন ভারতবর্ষে নূতন উন্মাদনা লইয়া শিখ, রাজপুত এবং মারাঠাদের অভ্যুদয় হইয়াছে। ঔরঙ্গজীবের আমলেই বঙ্গদেশে মুর্শিদকুলি খাঁ একরূপ স্বাধীন ভাবেই শাসন চালাইতেছিলেন। আলিবর্দী খাঁ শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিয়া একেবারেই স্বাধীন হইয়া গেলেন। দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ বা মীর কমরউদ্দিন চীন কিলিচ খাঁ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতে সুরু করেন। তেমনই অযোধ্যার শক্তিশালী শাসক সাদৎ খাঁ মুঘল বাদশাহের বিশেষ তোয়াক্কা করিতেন না। এই তিনটি 'সুবা' বা প্রদেশের শাসনকর্তারা নামে মাত্র মুঘল বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিতেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

ঔরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুয়াজ্জম্ বাহাদুর শাহ্ উপাধি লইয়া (জুন, ১৭০৭) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শিক্ষিত উদার ও নম্র ছিলেন। ১৭১২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বলা যায় যে তাঁহার শাসনকাল পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের একরকম ঠাট বজায় ছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দিল্লীতে ষড়যন্ত্র ও হত্যার নারকীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। দরবারে ওমরাহ্‌দের মধ্যে দলাদলি বাড়িতে থাকে এবং অযোগ্য ও অপদার্থ বাদশাহ্‌রা এই সকল চক্রান্তকারী ওমরাহ্‌দের

হাতের পুতুলে পরিণত হন। দিল্লীর আশেপাশেই বাদশাহ্‌দের বাদশাহী সীমাবদ্ধ থাকে।

মুঘল সাম্রাজ্যের এই দুরবস্থার খবর পাইয়া মুহম্মদ শাহের রাজত্ব-কালে পারস্য রাজ নাদির শাহ্‌ ভারতবর্ষ আক্রমণ ও দিল্লী লুণ্ঠন করেন। নাদির শাহের মৃত্যুর পর তাঁহারই এক সেনাপতি আহ্‌মদ শাহ্‌ আফগানিস্তানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

এইভাবে ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, স্থানীয় শাসকদের অত্যাচার ও অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইয়োরোপীয়রা রাজ-নৈতিক ক্ষমতা স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন পণ্ডিচেরীর ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লে। ডুপ্লেই প্রথমে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেন। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পণ্ডিচেরীর গভর্ণর নিযুক্ত হন। এই বৎসরেই ইয়োরোপে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এই বৎসরেই ডুপ্লের ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর



ডুপ্লে

ভারতে ইংরাজ প্রাধান্যের সূচনা

নিম্নপদস্থ কেরাণীর পদ লইয়া ভারতে উপস্থিত হন। ভারতেও ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিলে ক্লাইভ যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কর্ণাটে ও হায়দরাবাদের সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া যে বিরোধের সৃষ্টি হয় ফরাসী ও ইংরেজরা নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাহাতে এক এক পক্ষ অবলম্বন করেন। এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ফরাসীদের পরাজয় ঘটে এবং কর্ণাটে ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

১৬৮০ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজীব এক ফরমান্ জারি করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের উৎপীড়ন না করার এবং ব্যবসা-বানিজ্যে বাধা না দিবার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় রাজকর্মচারীরা অর্থ আদায়ের জন্য মাঝে মাঝে মালপত্র আটক করিত। ইংরাজরা বলপ্রয়োগে ইহাতে বাধা দিবার সিদ্ধান্ত করিলে মুঘল সম্রাটের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে পর্যুদস্ত ইংরাজেরা গঙ্গার মোহানায় এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ইংরাজ কর্মচারী জব চার্ণক আপোষ আলোচনা সুরু করেন। এই আলোচনার ফলে ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজরা সূতানুটিতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি লাভ করেন। ইহার পরও কিছুকাল বিরোধ থাকে। ১৬৯০ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানী ও সম্রাটের মধ্যে সন্ধি হয় এবং জব চার্ণক ঐ বৎসর আগস্ট মাসে বাঙ্গালায় ফিরিয়া সূতানুটিতে ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন।

জব চার্ণক

বর্ধমানের জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহ করিলে বিদ্রোহীদের হাত হইতে আত্মরক্ষার অজুহাতে ইংরাজরা ফ্যাক্টরী সুরক্ষিত করিবার অনুমতি পায় এবং ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দে তাহারা সূতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালীঘাট এই তিনটি গ্রামের ইজারা লাভ করে। এই ভাবেই

কলিকাতা মহানগরীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইংরাজরা ক্রমে যে কেল্লা নির্মাণ করে তাহাই ফোর্ট উইলিয়াম নামে পরিচিত। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন নবাব হন। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হন। সরফরাজ খাঁর কোন যোগ্যতা ছিল না। অল্পকালের মধ্যেই বিহারের তৎকালীন শাসনকর্তা আলীবর্দী খাঁ তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিলেন এবং বাদশাহ্ মুহম্মদ শাহ্‌কে প্রচুর উপঢৌকন দিয়া এক ফরমান্ আদায় করিয়া লইলেন। এবার আলিবর্দী খাঁ স্বাধীন ভাবেই বাঙ্গালা শাসন করিতে থাকেন। তিনি কর্মকুশল ছিলেন। মারাঠাদের সহিত বহু যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাদের সহিত সন্ধি করেন। ইহাতে বাঙ্গালা দেশ বর্গীর ভয়াবহ অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়। মারাঠা লুণ্ঠনকারীরা বাঙ্গালার "বর্গী" নামে পরিচিত ছিল। "ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে" প্রভৃতি ছড়া থেকে আমরা এই বর্গীদের উপদ্রব সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি। বিদেশী বণিকদের সম্বন্ধেও নবাব আলিবর্দী খাঁ বিশেষ সতর্ক ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধক্লান্ত নবাব দেশ শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র মির্জা মুহম্মদ বা সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে বাঙ্গালার নবাব হন। কর্মদক্ষ না হইলেও সিরাজউদ্দৌলা বুদ্ধিমান ছিলেন। ইংরাজরা যে ক্রমশঃ রাজ্যগ্রাসে অগ্রসর হইতেছে ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁও বিদেশী বণিকদের সুনজরে দেখিতেন না। তাঁহার জীবিত কালেই কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণের ব্যাপার লইয়া ইংরাজদের সহিত তাঁহার

বিরোধ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ইংরাজরা দুর্গ সম্প্রসারণ এবং কামান স্থাপন সুরু করে।

সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার বিনানুমতিতে ঐ সকল কাজ করিতে নিষেধ করেন। ইংরাজরা উহা অগ্রাহ্য করে। সিরাজউদ্দৌলা তখন কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। কলিকাতার মুষ্টিমেয় ইংরাজ আত্মসমর্পণ করে। ইতিমধ্যে সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার অন্যান্য প্রতিপক্ষকে অস্ত্র বলে অথবা কৌশলে অপসারিত করেন। সিরাজউদ্দৌলার মতি-গতি ইংরাজদের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। তাহারা প্রথম হইতেই সিরাজউদ্দৌলার নবাব হওয়া বন্ধ করার চেষ্টায় ছিল। এখন



সিরাজউদ্দৌলা

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত

তাহারা সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হইল। ক্লাইভ সৈন্যদল সহ আসিয়া সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মাণিক চাঁদের হাত হইতে কলিকাতা পুনরধিকার করিলে সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদের সহিত সন্ধি করেন। কিন্তু ঘরে বাহিরে তাঁহার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তের খবর পাইয়া সিরাজউদ্দৌলা এই সময় হইতে দুর্বলতার পরিচয় দিতে থাকেন। ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের তখন সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ সুরু হইয়াছে এবং ভারত হইতে ফরাসীদের বিতাড়িত করিয়া ইংরাজরা নিজেদের অধিকার বিস্তারে তখন কৃতসঙ্কল্প। তাহারা চাহিল সিরাজউদ্দৌলাকে সরাইয়া তাহাদের বশম্বদ কাহাকেও নবাব করিতে। ইহার সুযোগও মিলিল। আলিবর্দীর জামাতা মীরজাফর, রায়

দুর্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রভৃতি দেশদ্রোহীরা ক্লাইভের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। মীরজাফরকে নবাবের মস্‌নদে বসাইবার লোভ দেখাইয়া ক্লাইভ তাঁহাকে হাতের পুতুল বানাইলেন। বাঙ্গালার চরম দুর্দিন আসিয়া গেল।



ক্লাইভ

ইতিমধ্যে ইংরাজরা নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চন্দননগর অধিকার করিল। ক্রুদ্ধ সিরাজ-উদ্দৌলা সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। এদিকে আটঘাট বাঁধিয়া সন্ধি-ভঙ্গের মিথ্যা অভিযোগে ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে পলাশী প্রান্তরে বিশাল আম্রকাননে যুদ্ধের প্রহসন হইল। প্রধান সেনাপতি মীর-জাফরের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজরা একরূপ বিনাযুদ্ধেই জয়লাভ করিল। মোহনলাল, মীরমদন প্রভৃতির বীরত্ব ও দেশভক্তি নিষ্ফল হইয়া গেল। পলাতক নবাবকে মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল।

পলাশীর যুদ্ধ

যুদ্ধের প্রহসন হইলেও পলাশীর যুদ্ধ (২৩শে জুন—১৭৫৭) ভারতের ইতিহাসে পানিপথের যুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় স্মরণীয় ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলেই ইংরাজ বাঙ্গালার প্রকৃত শাসক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁবেদার নবাব মীরজাফর ইংরাজদের আজ্ঞানুবর্তী ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। জালিয়াতি হইতে সুরু করিয়া বহু অপকর্ম ক্লাইভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিই ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন

করিয়া সগৌরবে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন এবং লর্ড উপাধি লাভ করিলেন।

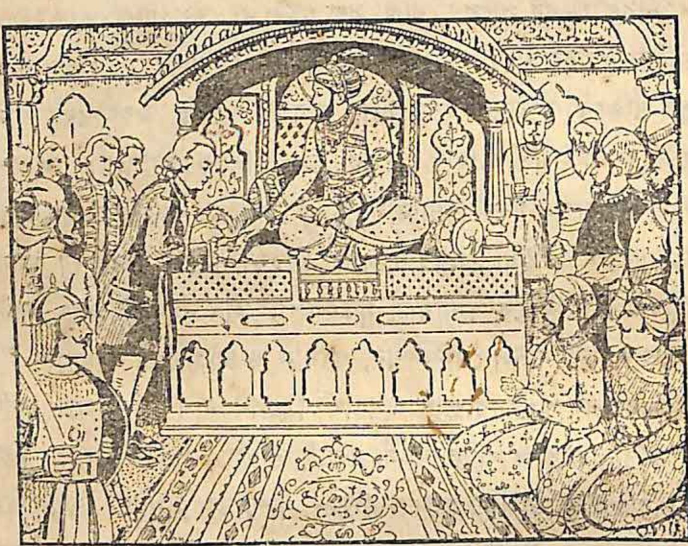
"মীরজাফরের পাপের বোঝা সহ্য হইল না, শেষ পর্যন্ত লোভী ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে সর্বস্ব দিয়াও রেহাই পাইলেন না। বাঙ্গালার বিপুল রাজকোষ রিক্ত হইয়া গেল, তবুও অর্থের জন্য কোম্পানীর কর্মচারীরা ক্রমাগত তাঁহার উপর চাপ দিতে লাগিল। অবশেষে কলিকাতার নূতন গভর্ণর ভ্যানসিটার্ট ও তাঁহার কাউন্সিলের সভ্যরা মীরজাফরকে সরাইয়া তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে বাঙ্গালার মস্‌নদে বসাইলেন। বিনিময়ে সপারিষদ গভর্ণর পাইলেন নগদ দুই লক্ষ পাউণ্ড এবং কোম্পানী পাইল মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রামের জমিদারী।"

মীরকাশিম

মীরকাশিম শ্বশুরের ন্যায় অপদার্থ ছিলেন না। ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ইংরাজ শক্তি বিনষ্ট করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি মুঙ্গেরে রাজধানী তুলিয়া লইয়া গিয়া পাশ্চাত্য প্রথায় সৈন্যবাহিনী গঠনে মন দিলেন এবং মিতব্যয়িতার দ্বারা আবার রাজকোষে অর্থসঞ্চয় করিতে মনোযোগ দিলেন। দেশীয় বণিকদের তিনি ইংরাজদের মতই বিনা শুল্কে বানিজ্যের অধিকার দিলেন। ধূর্ত ইংরাজ নবাবের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অকস্মাৎ পাটনা অধিকার করিয়া যুদ্ধ সুরু করিয়া দিল। বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) আধুনিক অস্ত্র ও রণকৌশলের নিকট মীরকাশিমকে পরাজয় বরণ করিতে হইল।

১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় লর্ড ক্লাইভ কোম্পানীর দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া ভারতে আসেন। ঐ বৎসরেই তিনি বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে বাদশাহের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার 'দেওয়ানী' অর্থাৎ কর আদায় করিবার অধিকার লাভ করিলেন। নবাবের সঙ্গেও একটা বন্দোবস্ত হইল। ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানী রাজস্ব আদায় ও সৈন্য রাখিয়া দেশরক্ষা করিবার ভার পাইলেন। দেশ শাসন ও বিচার বিভাগের ভার রহিল নবাবের উপর।



কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তি

এই দ্বৈত শাসনব্যবস্থায় দেশে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়িত্বহীন ইংরাজের যথেচ্ছ অত্যাচারে দেশ ছারখার হইতে লাগিল। বাঙ্গালা দেশে ১১৭৬ সনে (১৭৬৯-৭০ খ্রীঃ অব্দে) 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে প্রসিদ্ধ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বাঙ্গালার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়।

ব্রিটিশ ক্ষমতার বিস্তার

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ওয়ারেণ হেস্টিংসকে (১৭৭২) বাঙ্গালার গভর্ণর করিয়া পাঠানো হইল। হেস্টিংস দ্বৈত শাসন-প্রথা লোপ করিয়া দেশের শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব সমগ্রভাবেই গ্রহণ করিলেন। যে সময় ইংরাজরা বাঙ্গালা দেশে

আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল সেই সময় দক্ষিণ ভারতে মহীশূর রাজ্যে হায়দর আলী নামে এক বিক্রমশালী বীর রাজ্যবিস্তার সুরু করিয়া ছিলেন। মহীশূরের হিন্দু রাজার সামান্য সৈনিক হইতে তিনি শেষ পর্যন্ত মহীশূর রাজ্যে স্বকীয় কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করেন। হায়দর আলীর সহিত ইংরাজদের বিরোধ বাধিল। ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দে হায়দর অতর্কিতে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে



হেস্টিংস

উপস্থিত হইলে নিরুপায় ইংরাজরা তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী সন্ধি করিতে বাধ্য হন। পরে ইংরাজরা বিশ্বাসভঙ্গ করায় আবার হায়দর আলীর সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধে। হায়দর আলী রণনিপুণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন; তাঁহার পুত্র টিপু সুলতানও সুদক্ষ যোদ্ধা এবং শাসক ছিলেন। যুদ্ধে ইংরাজরা অনেক ক্ষেত্রেই পরাজিত হয়। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে হায়দরের মৃত্যুর পর টিপু সুলতানের সহিত



হায়দর আলী

ইংরাজদের এক সন্ধি হয়। ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে টিপু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ

করিলে মিত্ররাজ্য রক্ষার জন্য ইংরাজরা নিজাম ও মারাঠাদের সহিত মিলিতভাবে টিপুকে আক্রমণ করেন। টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম্ অবরুদ্ধ হয়। বীরবিক্রমে লড়িয়াও টিপুকে শেষপর্যন্ত নতি স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে হয়। টিপু পরে ফ্রান্সের দিগ্বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। ইংরাজরা তাঁহাকে বশ্যতামূলক সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলে তিনি ঘৃণাভরে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন; ফলে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। টিপু বীরের মতই যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন (৪ঠা মে, ১৭৯৯)। তখন মহীশূর রাজ্যের একাংশ ইংরাজরা অধিকার করে। কতকাংশ নিজামকে দেওয়া হয় এবং বাকি অংশ মহীশূরের পুরাতন হিন্দু রাজবংশের হাতে অর্পণ করা হয়। কর্ণাটের নবাব টিপুর সহিত চক্রান্ত করিয়াছিলেন এই অভিযোগে কর্ণাট রাজ্যও ইংরাজরা গ্রাস করে (১৮০১)।



টিপু সুলতান

টিপু সুলতান সুশাসক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সাহসী, রণনিপুণ, পরিশ্রমী, সদাশয়, বিদ্বান ও জনপ্রিয় রাজা কদাচিৎ দেখা যায়। উদার ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এই মুসলমান নৃপতির বিরুদ্ধে বিদেশী ঐতিহাসিকরা ইচ্ছা করিয়াই বহু অপবাদ প্রচার করিয়াছে।

বৈদেশিক রাজনীতিতে সে যুগের ভারতে একমাত্র টিপু সুলতানই

আগ্রহ দেখান। তিনি ফ্রান্স, তুরস্ক ও আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন।

মারাঠাদের পরাজয়

সম্রাট ঔরঙ্গজীবের আমলে ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে যে বিশাল মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (২৩শে জুন, ১৭৬১) সেই শক্তির পরাজয় ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করিয়া দিল। পেশোয়ারা প্রথমে ছিলেন শিবাজীর বংশধরদের মন্ত্রী। কালক্রমে তাঁহারাই সর্বময় ক্ষমতা লাভ করেন। পানিপথের যুদ্ধে পেশোয়াদের পতন না হইলেও মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন শূন্যে মিলাইয়া গেল। আহ্মদ্ শাহ্ আবদালির জয় কার্যতঃ ইংরাজদের প্রভুত্ব বিস্তারের সহায়তা করিল।

পানিপথের যুদ্ধের পর পেশোয়া প্রথম মাধবরাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি আবার প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে মাধব রাওএর মৃত্যু হওয়ায় (১৭৭২) অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মারাঠারা আবার হীনবল হইয়া পড়ে। মাধবরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হইলেন। নারায়ণ রাও-এর কাকা রঘুনাথের চক্রান্তে নারায়ণ রাও নিহত হন। তাঁহার হত্যার পর তাঁহার পত্নীর এক পুত্র হয়। রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেও নারায়ণ রাও-এর সমর্থকরা তাঁহাকে মানিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা নারায়ণ রাও-এর নবজাত পুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এই অবস্থায় রঘুনাথ ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং ইংরাজদের সাল্‌সেট ও বেসিন দেওয়ার এবং যুদ্ধের সময় ব্যয়ভার বহন করার লোভ দেখাইয়া যুদ্ধে নামাইলেন। নানা ফড়্‌নবীশের নেতৃত্বে (প্রকৃত নাম বালাজী জনার্দন) দেশপ্রেমিক মারাঠারা যুদ্ধে অবতীর্ণ

হইলেন। সিন্ধিয়া প্রভৃতি মারাঠা রাজশক্তিকে একত্রিত করিয়া নানা ফড়্নবীশ ইংরাজদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইংরাজরা যুদ্ধে সুবিধা করিতে পারে নাই। ফলে মারাঠা শক্তি আবার কিছুটা প্রবল হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ ইন্দোররাজ মহাদোজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হয় এবং তরুণ পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণ আত্মহত্যা করেন। এই সময় মারাঠাদের দলাদলি প্রবল আকার ধারণ করে। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে নানা ফড়্নবীশের মৃত্যু হয়। ইহার পর মারাঠারা দুইবার ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তৃতীয় বা শেষ মারাঠা-যুদ্ধে মারাঠা শক্তির পতন ঘটে।



নানা ফড়্নবীশ

ভারতে বিভিন্ন দেশীয় রাজশক্তির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকা কালে লর্ড ওয়েলেস্লীর (১৭৯৮-১৮০৫) আমলে ইংরাজরা এক নূতন রাষ্ট্রনীতি প্রবর্তন করেন। ইহার নাম "বশ্যতামূলক মৈত্রী" (Subsidiary Alliance). এই মৈত্রীর নীতি অনুসারে দেশীয় রাজারা নিজ নিজ রাজ্যে একদল করিয়া ব্রিটিশ সৈন্য রাখার ও ঐ সৈন্যদের ব্যয় বহনের জন্য নিজ নিজ রাজ্যের কিছু কিছু অংশ সমর্পণ করার বিনিময়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আশ্রয় পাইবেন এই ব্যবস্থা হয়।

সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রাজাদের ইংরাজদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইত এবং ইংরাজদের বিনা অনুমতিতে তাঁহারা অন্য কোন শক্তির সহিত কোন সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিতেন না।

হায়দরাবাদের নিজাম ও অযোধ্যার নবাব এই অবমাননাকর সন্ধি-সর্ত মানিয়া লইলেন। পরে কুশাসনের অভিযোগে ওয়েলেস্‌লী অযোধ্যা কাড়িয়া লন।

গুরু নানক প্রতিষ্ঠিত শিখ সম্প্রদায় গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে এক দুর্ধর্ষ সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। মুঘল শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ার ফলে শিখরা আরও প্রবল হইয়া উঠে। আফগানিস্থানের রাজা আহ্‌মদ্ শাহ্ আব্‌দালি পাঞ্জাব দখল করিলে শিখদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু শিখদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য না থাকায় আফগানদের তাহারা বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখরা পাঞ্জাবে আফগান প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া পরাক্রান্ত শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

রণজিৎ সিংহ ও শিখ সাম্রাজ্য

রণজিৎ সিংহের পিতা একটি শিখ 'মিস্‌ল্' বা দলের নেতা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র বারো বৎসর বয়সে রণজিৎ সিংহ দলের নেতা হইলেন। আহ্‌মদ্ শাহ্ আব্‌দালির পৌত্র আফগানরাজ জমান শাহ্‌কে পাঞ্জাব আক্রমণে সাহায্য করায় তিনি রণজিৎ সিংহকে 'রাজা' উপাধি দিয়া লাহোরের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। রণজিৎ সিংহ ক্রমে অন্যান্য শিখ 'মিস্‌ল্' বা দলগুলিকে একত্রিত করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী শিখরাজ্যগুলি অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হন। তখন ঐ সকল শিখরাজ্য ব্রিটিশের সাহায্য প্রার্থনা করে।

তৎকালীন ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড মিণ্টো রণজিৎ সিংহের নিকট এক দূত পাঠান। দূতের সহিত আলোচনার পর রণজিৎ সিংহ ব্রিটিশের সহিত এক সন্ধি করেন। এই সন্ধিতে তিনি শতদ্রু অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁহার জীবিতকালে রণজিৎ সিংহ এই সন্ধির অবমাননা করেন নাই। ইহার পর রণজিৎ সিংহ আফগানদের পরাজিত করিয়া পেশোয়ার কাড়িয়া লন।



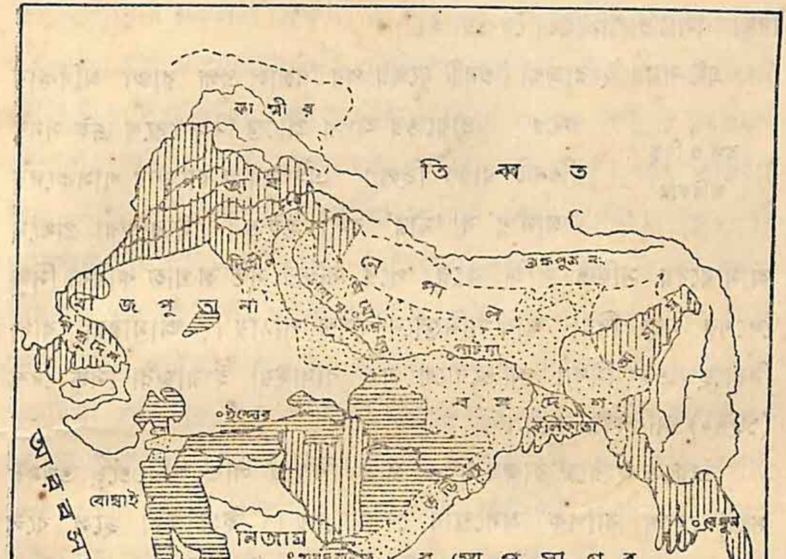
রণজিৎ সিংহ

রণজিৎ দক্ষ, কর্মতৎপর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রণনিপুণ ছিলেন। পাশ্চাত্য সেনানায়কদের সাহায্যে তিনি শিখ সৈন্যদের ইয়োরোপীয় যুদ্ধ প্রণালীতে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে মূলতান পর্যন্ত এবং পূর্বে শতদ্রু হইতে পশ্চিমে পেশোয়ার পর্যন্ত শিখসাম্রাজ্য বিস্তার করেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়।

শিখ সাম্রাজ্যের পতন

রণজিৎ সিংহের বালকপুত্র দলীপ সিংহ রাজা হইলে শিখদের মধ্যে দলাদলি সুরু হয়। সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখার মত কোন যোগ্য লোক না থাকায় শেষ পর্যন্ত তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। এই সুযোগে ইংরাজরা যুদ্ধ বাধাইয়া শিখদের পরাজিত করে। শিখ ও ইংরাজদের মধ্যে দুইবার যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে ক্ষতিপূরণের সমস্ত টাকা শিখরা না দিতে পারায় গুলাব সিংহ নামক ডোগরা রাজপুত কর্মচারীর নিকট কাশ্মীর ও জম্মু

ভারতবর্ষ


কাশ্মীর
তিব্বত
দিল্লী
নেপাল
রাজপুতানা
পাটনা
মধ্য দেশ
কলিকাতা
ইন্দোর
বোম্বাই
আরব সাগর
নিজাম
বঙ্গোপসাগর
মহীশূর
মাদ্রাজ
তাঞ্জোর
সিংহল
ভারত মহাসাগর
ওয়েলেসলির সময়ে
বৃটিশ অধিকার
১৮২৩ খৃষ্টাব্দ
বৃটিশ অধিকার
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ
বৃটিশ অধিকার

বিক্রয় করা হয়। ইংরাজরা মুলতান ও গুজরাটের যুদ্ধে (১৮৪৯) জয়ী হইয়া পাঞ্জাব দখল করে এবং বালক রাজা দলীপ সিংহকে বৃত্তি দিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ব্রহ্ম ও সিন্ধু অধিকার

এই সময় ইংরাজরা তিনটি যুদ্ধের পর বিশাল ব্রহ্ম রাজ্য অধিকার করে। ভারতের অপর প্রান্তে সিন্ধু দেশে এই সময় তিনটি রাজ্য ছিল। এই সকল রাজ্যের শাসকদের 'আমীর' বা 'মীর' বলা হইত। ইংরাজরা প্রথমে আমীরদের সহিত সন্ধি করে, পরে সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া সিন্ধু দেশের মধ্য দিয়া আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠায়। আমীররা বাধা দিয়াছে এই মিথ্যা অভিযোগে যুদ্ধ বাধাইয়া ইংরাজরা সিন্ধু দেশ (১৮৪০) অধিকার করে।

সিপাহী বিদ্রোহ

ভারতে ইংরাজ রাজত্ব যখন দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে তখনই সারা দেশে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। ইংরাজরা ছলে বলে কৌশলে একটির পর একটি দেশীয় রাজ্য গ্রাস করিতেছিল। সর্বশেষে লর্ড ডালহৌসীর কার্যকলাপে দেশীয় রাজাদের উদ্বেগ চরমে উঠে এবং রাজ্যচ্যুত রাজাদের প্রতি লোকে স্বতঃই সহানুভূতি দেখাইতে থাকে। সমাজ সংস্কারের নামে দেশে যে পরিবর্তন ইংরাজরা আনিতেছিল, তাহা জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার করিল। রেল, ডাক এবং তার বিভাগের পত্তন নিশ্চয়ই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, কিন্তু প্রাচীন জীবনের পরিচিত ধারায় সাধারণ মানুষের মনে যে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল তাহা আর রহিল না। পল্লীসমাজের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য পরিবর্তনের ধাক্কায় হারাইয়া গেল, কিন্তু নূতন জীবনেও কৃষক ও সাধারণ ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশার অবধি রহিল না। হিন্দু ও মুসলমানকে খ্রীষ্টান করিতে পাদ্রীদের উৎকট আগ্রহ দেখা

দিল। খ্রীষ্টানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, এবং পদস্থ ইংরাজদের দায়িত্বহীন কথাবার্তা ও কাণ্ডকারখানায় সকলে শংকিত হইয়া উঠিল। কোম্পানী হিন্দু-মুসলমান সকলকে খ্রীষ্টান করিতে চায় বলিয়া সিপাহীদের ধারণা হইল। গরু ও শূকরের চর্বি টোটাতে মাখানো হইতেছে এবং সেই টোটা দাঁত দিয়া কাটিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে হইবে শুনিয়া হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা স্বভাবতই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ইংরাজের হইয়া লড়িবার জন্য তাহাদিগকে সমুদ্রযাত্রায় বাধ্য করা হইবে জানিয়াও তাহাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইল। দেশীয় সিপাহী ও গোরা সৈন্যের মধ্যে বেতন, ব্যবহার ও সুখসুবিধার ব্যাপারে প্রচণ্ড তারতম্য প্রচলিত ছিল, এবং সিপাহীদের অসন্তোষ প্রকাশ পাইলে, জীবন্ত অবস্থায় কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়ার মত বর্বর প্রথায় নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। দেশের প্রায় সর্বশ্রেণীর মধ্যে যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইতেছিল, তাহা ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের আকারে ফাটিয়া পড়িল। বিদ্রোহীরা প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজ রাজত্বের অবসান চাহিতেছিল, তাই তাহারা মুঘল বাদশাহ্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। প্রথমে বাঙ্গালা দেশের ব্যারাকপুরে সুরু (২৯শে মার্চ, ১৮৫৭) হইয়া বিদ্রোহের আগুন দ্রুত দিল্লীকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় সমগ্র উত্তর প্রদেশ, বুন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমান্বয়ে পাঞ্জাবে এবং আম্বালাতেও বিদ্রোহ হয়।

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

বিদ্রোহীদের মধ্যে ঝান্সীর বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর নেতৃত্বের যোগ্যতা ছিল। ইংরাজের কবল হইতে স্বামীর হৃতরাজ্য উদ্ধার করার জন্য রাণী লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন। এই বীর নারী পুরুষের বেশে তরবারী হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি অমর হইয়া আছেন। বেতোয়ার যুদ্ধে ঝান্সী অধিকৃত হয় (১৮৫৮)। ইহার পরই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

ইংরাজদের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা নানা কারণে সম্ভব হয়। প্রথমতঃ, অধিকাংশ দেশীয় রাজা ইংরাজদের সমর্থন করেন। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্রোহীদের সুস্পষ্ট সাধারণ কোন কর্মপন্থা ছিল না এবং যোগ্য নেতৃত্ব ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব ছিল। বিশেষ করিয়া দীর্ঘকাল অরাজকতার পর ইংরাজ শাসনে মোটামুটি শান্তি স্থাপিত হওয়ায় বহুস্থানে জনসাধারণ সক্রিয় ভাবে বিদ্রোহীদের সহিত সহযোগিতা করে নাই।

তথাপি এই বিদ্রোহে ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত্তির মূল নড়িয়া গিয়াছিল এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

অনুশীলনী

(১) ভারতে ইংরাজ প্রাধান্যের সূচনা কিভাবে হইল বর্ণনা কর।

(২) "যুদ্ধের প্রহসন হইলেও পলাশীর যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে পাণিপথের যুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় স্মরণীয় ঘটনা"—ব্যাখ্যা কর।

(৩) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ :—

(ক) জব চার্ণক ; (খ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা ; (গ) মীরকাশিম (ঘ) লর্ড ক্লাইভ।

(৪) দ্বৈত শাসন কাহাকে বলে ? ইহার ফল কি হইয়াছিল ?

(৫) মারাঠা শক্তির পরাজয়ের কারণগুলি বর্ণনা কর।

(৬) সিপাহী বিদ্রোহের কারণ কি ? উহা কেনই বা ব্যর্থ হইল, উহার ফলই বা কি হইয়াছিল ?

(৭) নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

(ক) হায়দর আলী ; (খ) টিপু সুলতান ; (গ) রণজিৎ সিংহ (ঘ) ঝান্সীর রাণী লক্ষীবাঈ ; (ঙ) নানা ফড়্নবীশ ; (চ) "বশ্যতামূলক" মৈত্রী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমেরিকার বিপ্লব ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গঠন

ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং আর্থিক সুযোগ সুবিধার জন্য সপ্তদশ শতকের প্রথম দিক হইতেই বহু ইংরাজ মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া নূতন মহাদেশ আমেরিকার উপকূলে বসতি স্থাপন করিতে যাইত। ইংল্যাণ্ডে রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে পিউরিট্যানদের উপর প্রবল উৎপীড়ন আরম্ভ হইলে বহু পিউরিট্যান ধর্মযাজক তাঁহাদের শিষ্যদের একত্রিত করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। এই ভাবে উত্তর আমেরিকায় ইংরাজদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নবাগত ইংরাজরা আদি অধিবাসী "রেড ইণ্ডিয়ান"দের বিতাড়িত করিয়া উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে বসতি স্থাপন করে। তাহারা অরণ্য কাটিয়া সভ্য মানুষের উপনিবেশ গড়িয়া তোলে। এইভাবে তেরটি উপনিবেশের সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ৫০ বৎসর কাল এই উপনিবেশগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কার্যতঃ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। শুধু মাত্র ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে বিধিনিষেধ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ইংল্যাণ্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত এবং বিদেশের সহিত উপনিবেশগুলির সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার ছিল না। অবশ্য এ সমস্ত ব্যাপারে বিধিনিষেধ কঠোর ভাবে প্রযুক্ত হইত না এবং উপনিবেশগুলি প্রায়ই বিধিনিষেধ এড়াইয়া ব্যবসা বাণিজ্য চালাইত।

ফ্রান্সের সহিত সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল, কাজেই উত্তর আমেরিকার সৈন্যদল রাখার খরচ উপনিবেশগুলির নিকট আদায় করা ইংরাজ সরকার সঙ্গত বলিয়া মনে

করিলেন। উত্তর আমেরিকার ইংরাজ উপনিবেশগুলি রক্ষার দায়িত্ব ইংরাজ সরকারের। অতএব ঔপনিবেশিকদের যুদ্ধ ও দেশরক্ষার ব্যয় বহনের জন্য আরও অর্থ দেওয়া উচিত, এই যুক্তি দেখাইয়া তাঁহারা ব্যবসাবাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি কঠোর ভাবে প্রয়োগ করিতে সুরু করিলেন। নূতন নূতন কর ও শুল্ক ধার্য করা হইল। ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী গ্রেন্‌ভিল ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে 'স্ট্যাম্প আইন' নামে এক আইন পাশ করিলেন। মামলা-মোকদ্দমার কাগজপত্রে স্ট্যাম্প লাগাইতে হইত। ইংরাজ সরকার স্ট্যাম্প বেচিয়া কর আদায় করিতে লাগিলেন।

ফ্রান্স পরাজিত হওয়ার পর ক্যানাডা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ক্যানাডা ফরাসীদের হাতে থাকায় ইংরাজ ঔপনিবেশিকরা ভয়ে ভয়ে থাকিত। এখন সে ভয় কাটিয়া গেল। মাতৃভূমির সাহায্য ছাড়া ফরাসীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন জানিয়া ঔপনিবেশিকরা ইংরাজ সরকারের সহিত বিরোধ বাধাইতে সাহস করিত না। এখন তাহারা নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিল। মাতৃভূমির অভিভাবকত্ব অস্বীকার করার কথা তাহারা ভাবিতে সুরু করিল।

স্ট্যাম্প আইন অনুযায়ী কর না দিবার জন্য ঔপনিবেশিকরা স্ট্যাম্প মারা কাগজপত্র ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিল। বিভিন্ন পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হইলে তাহারা ঐ সকল পণ্য বর্জন করিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উপনিবেশগুলির কোন প্রতিনিধি নাই; সুতরাং ঔপনিবেশিকদের উপর পার্লামেণ্টের কর ধার্য করার দাবি শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের মূল সূত্রের বিরোধী—ইহাই ছিল উপনিবেশগুলির বক্তব্য।

ইংল্যাণ্ডে লর্ড নর্থ প্রধান মন্ত্রী হইয়া চা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত

জিনিসের উপর ধার্য শুল্ক নাকচ করিয়া দিলেন। উপনিবেশগুলির উপর ইংল্যাণ্ডের কর ধার্যের অধিকার বহাল রাখিবার জন্য শুধু চা-এর উপর শুল্ক বজায় রাখা হইল। ইহাতে বিক্ষোভ কমিল না। ভারতবর্ষ হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বোম্বাই বন্দরে চা রপ্তানী করিলে আমেরিকানরা রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠিয়া সমস্ত চা-এর বাক্স জলে ফেলিয়া দিল। এই খবর ইংল্যাণ্ডে পৌছিলে ইংরাজ সরকার বোস্টন বন্দর বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ঔপনিবেশিকদের দমন করিবার জন্য পর পর কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। 'পাঁচটি অসহনীয় আইন' নামে পরিচিত ঐ সকল দমনমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে জর্জিয়া ব্যতীত সমস্ত উপনিবেশের প্রতিনিধিরা ফিলাডেলফিয়ার এক কংগ্রেসে (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৭৪) মিলিত হইয়া এক অধিকারপত্র (Declaration of Rights) প্রণয়ন করিলেন। এই কংগ্রেসেই বৃটিশ পণ্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই এপ্রিল ম্যাসাচুসেট্স-এর ঔপনিবেশিকরা কনকর্ড শহরে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র মজুত করিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ সেনাপতি জেনারল টমাস গেজ (Gage) একদল সৈন্য পাঠাইলেন। পরদিন প্রত্যুষে সশস্ত্র ঔপনিবেশিকদের সহিত ঐ সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ হইল। আমেরিকানদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম রক্তপাত ঘটিল।

প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া ইংরাজদের সহিত আমেরিকানদের যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধে ফরাসীরা আমেরিকানদের প্রভূত সাহায্য করে। ইংল্যাণ্ডে অনেকেই ইংরাজ সরকারের নীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। বিখ্যাত বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক উপনিবেশ সমূহের সহিত বন্ধুভাবে চলার নীতি দৃঢ় ভাবে সমর্থন করিতে থাকেন।

প্রথম দিকে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর আমেরিকানরা যুদ্ধ-পরিচালনায় আরও দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়। ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা জুলাই জন এডামস্, ফ্রাঙ্কলিন, শেরম্যান প্রভৃতি নেতারা ফিলাডেলফিয়া নগরে অনুষ্ঠিত এক কংগ্রেসে মিলিত হইয়া বিখ্যাত 'স্বাধীনতা ঘোষণা'র (Declaration of Independence) দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার ঐ গৌরবোজ্জ্বল দিবসটি আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দিবস রূপে পালিত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণা



এডমণ্ড বার্ক

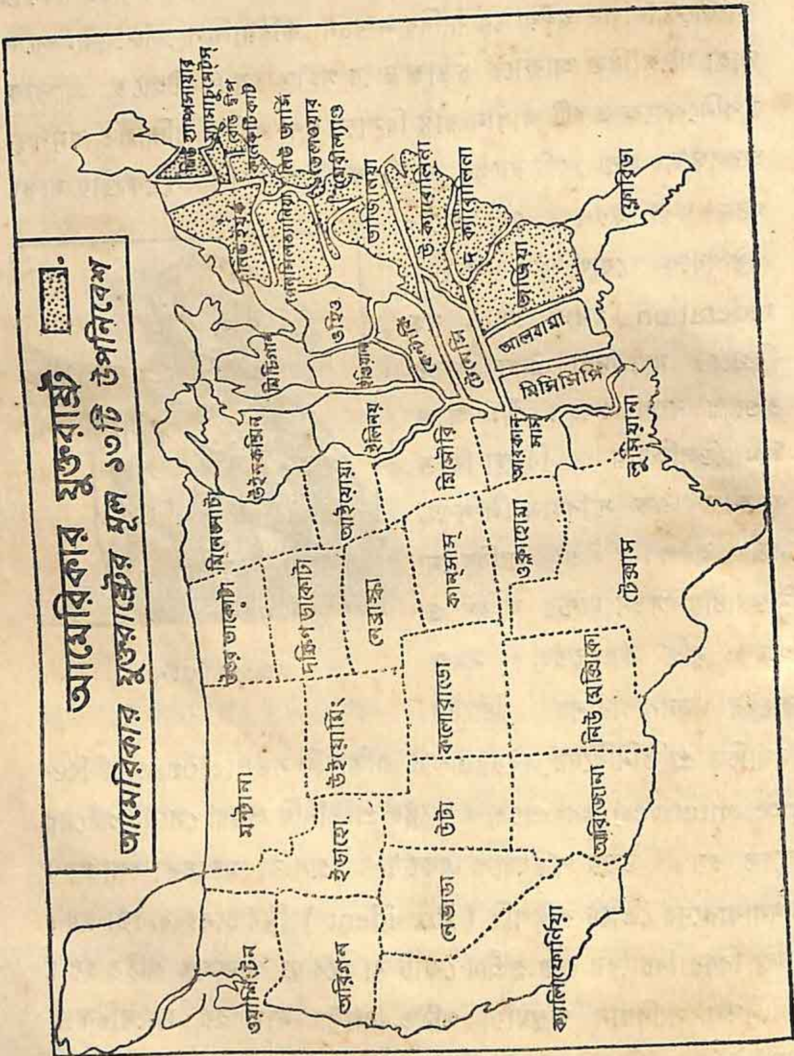
জর্জ ওয়াশিংটন এই সময় সমুদয় আমেরিকান বাহিনীর অধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন। জর্জ ওয়াশিংটন খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার দেশপ্রেম, চরিত্রের দৃঢ়তা ও গণতন্ত্রপ্রীতির জন্য আমেরিকানরা তাঁহাকে নেতার পদে বরণ করিয়া লন। সারাটোগা অধিকার করিয়া ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে আমেরিকানরা বিজয় অভিযান শুরু করে এবং ঐ বৎসরেই ফ্রান্স আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে ভারতের ভাবী বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিসের সেনাপতিত্বে পরিচালিত সমগ্র ব্রিটিশ বাহিনী আত্মসমর্পণ করিলে যুদ্ধ শেষ হয়। ইহার পর ভের্সাই সন্ধি (১৭৮৩) অনুসারে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকাস্থ উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন।

১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলি ফিলাডেলফিয়ার কংগ্রেসে মিলিত হইয়া যে সংবিধান রচনা করিয়াছিল ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে তাহা সংশোধিত আকারে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। উহাতে প্রত্যেক উপনিবেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করিয়া সম্মিলিত কর্মপন্থা অবলম্বনের জন্য ১৩টি রাষ্ট্রের একটি স্থায়ী অথচ শিথিল কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করা হয়। এই ধরণের রাষ্ট্রসংঘকে যৌথরাষ্ট্র (Confederation) বলা হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়া ঐক্য দৃঢ়তর হওয়ার ফলে ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে ফিলাডেলফিয়ায় বিস্তারিত আকারে এক সংবিধান লিপিবদ্ধ করা হইল। এই সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইল। সমস্ত রাষ্ট্রের জনসাধারণের ভোটের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া একটি প্রতিনিধি সভা (House of Representatives) এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া সেনেট গঠনের ব্যবস্থা হয়। উভয় পরিষদকে একত্রে কংগ্রেস বা মহাসভা বলা হয়। জনসাধারণের ভোটে রাষ্ট্রপতি (President) নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। সমস্ত বিষয় বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত গঠিত হয়।



জর্জ ওয়াশিংটন

নূতন সংবিধান অনুযায়ী গঠিত রাষ্ট্রের নাম হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে জর্জ ওয়াশিংটন নূতন রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মূল ১৩টি উপনিবেশ
ওয়াশিংটন
অরিগন
ক্যালিফোর্নিয়া
নেভাডা
ইডাহো
মন্টানা
উটা
অ্যারিজোনা
উইয়োমিং
কলোরাডো
নিউ মেক্সিকো
উত্তর ডাকোটা
দক্ষিণ ডাকোটা
নেব্রাস্কা
কান্সাস্
ওক্লাহোমা
টেক্সাস
মিনেসোটা
আইওয়া
মিসৌরি
আরকান্সাস
লুইসিয়ানা
উইস্কন্সিন
ইলিনয়
মিসিসিপি
আলবামা
জর্জিয়া
ফ্লোরিডা
টেনেসি
ওহিও
মিচিগান
ভার্জিনিয়া
উঃ ক্যারোলিনা
দঃ ক্যারোলিনা
নিউ ইয়র্ক
পেনসিলভানিয়া
মেরিল্যান্ড
ডেলাওয়ার
নিউ জার্সি
কনেক্টিকাট
ম্যাসাচুসেট্স
নিউ হ্যাম্পশায়ার

পুরাতন জগতের পুরাতন ঐতিহ্যের বন্ধন কাটাইয়া নূতন মহাদেশে ইংরাজ ও অন্যান্য জাতির উপনিবেশ স্থাপনকারিরা এক নূতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে। রাজাহীন, অভিজাতহীন এক নূতন ধরণের গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়। ইয়োরোপে ইহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ঘটে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জগতের অন্যতম অতি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হয়।

ইয়োরোপ হইতে দলে দলে লোক নূতন করিয়া সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করার আশায় আমেরিকায় যাইতে থাকে এবং অনতিকালের মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল ভাগ হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত 'বন্য পশ্চিম' (Wild West) বলিয়া অভিহিত বিশাল ও প্রায় জনশূন্য ভূভাগে মানুষের বসতি গড়িয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে নূতন মহাদেশে নূতন ৩৫টি রাষ্ট্র গঠিত হয়।

অনুশীলনী

১। আমেরিকা কিরূপে স্বাধীনতা অর্জন করিল তাহা বর্ণনা কর।

২। আমেরিকার উপনিবেশগুলির সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরোধের কারণ কি ?

৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ :—

(ক) স্ট্যাম্প আইন (খ) অধিকার পত্র (Declaration of Rights) (গ) স্বাধীনতা ঘোষনা (Declaration of Independence).

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফরাসী বিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পে, সাহিত্যে, ব্যবসা বাণিজ্যে ইয়োরোপে ফ্রান্সের মর্যাদা ছিল খুব বেশী। ফ্রান্সের নব-উত্থিত মধ্য শ্রেণী বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভ করিয়া তখন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ফ্রান্সের সাহিত্য ও প্রগতিশীল ভাবধারা সারা ইয়োরোপের শিক্ষিত মহলে সাড়া জাগাইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী সমাজের কাঠামো তখনও মধ্য যুগেরই উপযোগী ছিল বলিয়া দেশের স্বাভাবিক উন্নতির পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি হইতেছিল। অভিজাত শ্রেণী রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল প্রকার সুখ সুবিধা ভোগ করিতেন। কৃষকদের ঘাড়ে করের বোঝা চাপাইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে বিলাস-বহুল জীবন যাপন করিতেন। অথচ তাঁহাদের কোন কর দিতে হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "বড় মানুষে কর দেয় না, ধর্মযাজকেরা কর দেয় না। রাজপুরুষেরা কর দেয় না—কেবল দীন দুঃখী কৃষকেরা কর দেয়। তাহার উপর কর-সংগ্রাহকদিগের অত্যাচার।"

রাজার কর্তৃত্ব ছিল সর্বময়। রাজদরবারের বিপুল আড়ম্বর এবং ঐশ্বর্যে লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়া যাইত। রাজার আড়ম্বর ঐশ্বর্যের অপচয়ে অভিজাত শ্রেণীর লাভ হইত। রাজার অনুকরণে তাঁহারাও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করিতেন এবং নানাভাবে বিভিন্ন পদ লাভ করিয়া জনসাধারণকে যথেচ্ছ শোষণের সুযোগ পাইতেন। ধর্ম-যাজকরাও অভিজাত শ্রেণীর অনুরূপ সুখ সুবিধা ভোগ করিতেন।

সাধারণ মানুষ গভর্ণমেণ্টের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিত, কিন্তু তাহাদের কোন অধিকার ছিল না। রাজকার্য পরিচালনায় তাহাদের হাত ছিল না। প্রধানতঃ অভিজাত ও সাধারণ কৃষকদের মধ্যবর্তী

ধনিক শ্রেণী ও কৃষকদের উপরেই সর্বপ্রকার করের বোঝা চাপানো হইত। এই মধ্য শ্রেণীর চেষ্টাতেই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল, ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভ করিয়াছিল। যদিও শক্তিসামর্থ্য ও তৎপরতায় সকল দিক হইতেই তাঁহারা অভিজাত শ্রেণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন তথাপি তাঁহাদের কোন বিষয়ে কিছু করিবার বা বলিবার সুযোগ ছিল না।



অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অভিজাত, মধ্যবিত্ত এবং
দরিদ্র শ্রেণীর পোশাক পরিচ্ছদ

অভিজাত জমিদার শ্রেণীর হাতে কৃষকরা সর্বপ্রকারে নির্যাতিত হইত। তাহাদের পশুর মত জীবন যাপন করিতে হইত। জমিদারদের খেয়াল খুসী মত খাজনা বা নজরাণা যোগাইতে না পারিলে প্রজাদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হইত, এমন কি হত্যা পর্যন্ত করা হইত। শিকার যোগ্য বন্য জন্তুরা ক্ষেত্রের শস্যাদি নষ্ট বা গৃহপালিত পশু বধ করিলেও সে সমস্ত জন্তু জানোয়ার প্রজাদের মারিবার অধিকার ছিল না। জমিদারদের শিকারের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রজাদের ঐ সকল বন্য জন্তু ও জানোয়ারের উপদ্রব সহ্য করিতে হইত। গরীব চাষী, জমিহীন চাষী বা ক্ষেত মজুরদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। জমিদারদের বেগার খাটিয়া এবং বহু পরিশ্রমলব্ধ ফসলের অধিকাংশ জমিদার বা জমিদারদের অনুচরদের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়া তাহাদের

অর্ধাশনে অনাহারে ও রোগে মৃত্যু বরণ করিতে হইত। কারিগররা যথেষ্ট পরিমাণে কাজ পাইত না এবং শহরের গরীব লোকেরা অনশনে অধাশনে কাটাইতে বাধ্য হইত।

চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। পঞ্চদশ লুই-এর রাজত্বকালে (১৭১৫—১৭৭৪) অসংখ্য যুদ্ধ, রাজ দরবারের বিপুল আড়ম্বর এবং রাজ পরিবারের বিলাসব্যসনে অপরিমিত ব্যয় দেশকে দ্রুত ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া গেল। জন-সাধারণের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিল ভল্‌টেয়ার ও রুসোর রচনার মধ্য দিয়া।

ভল্‌টেয়ারের (১৬৯৪—১৭৭৪) তীব্র শ্লেষাত্মক রচনা ফরাসী সমাজের সমস্ত গলদকে লোকের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল।

ভল্‌টেয়ার ও রুসো

দার্শনিক, নাট্যকার, ঐতিহাসিক এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে ভল্‌টেয়ার সেদিন ইয়োরোপের শিক্ষিত মহলের গুরু বলিয়া বিবেচিত হইতেন। সনাতন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র আক্রমণ শিক্ষিত মহলে সাড়া জাগাইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে কারারুদ্ধ ও ইংল্যাণ্ডে নির্বাসিত করিয়া সারা ইয়োরোপে তাঁহার প্রভাব ছড়াইয়া দিতেই সাহায্য করিয়াছিলেন।

জ্যাঁ-জাক্ রুসো (১৭১২—৭৮) তাঁহার জগদ্বিখ্যাত 'সোশাল কনট্রাকট' বা সামাজিক চুক্তি নামক গ্রন্থে যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার করিলেন তাহা শুধু ফ্রান্স নহে, সমগ্র ইয়োরোপে এক নূতন ভাবের বন্যা বহাইয়া দিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নেতা লাফেইয়েৎ নিজে অন্যান্য ফরাসী স্বেচ্ছাসৈনিকদের সহিত আমেরিকায় গিয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে

লড়িয়াছিলেন। আমেরিকার নূতন গণতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা দেশে ফিরিলেন। ইংরাজ রাজশক্তিকে হারাইয়া আমেরিকায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্বাধীনতার নূতন উন্মাদনা ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়িল।

ষোড়শ লুই-এর রাজত্বকালে (১৭৭৪—১৭৯২) অবস্থা চরমে উঠিল। রাজদরবারের আড়ম্বর এবং ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের অকর্মণ্যতায় অর্থসংকট প্রবল আকারে দেখা দিল। অভিজাত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝিতেন না। কর হইতে তাঁহারা রেহাই পাইবেন, এই অবস্থার কোন পরিবর্তনে তাঁহারা রাজী হইলেন না। ফলে রাজকোষে অর্থাগমের কোন উপায় রহিল না। আমেরিকার যুদ্ধের পর সংকট যখন ঘনীভূত হইয়া উঠিল তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া রাজা ষোড়শ লুই "স্টেট্‌স জেনারেল" আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসর পরে জনসাধারণ তাহাদের মতামত প্রকাশের কিছু সুযোগ পাইল। স্টেট্‌স জেনারেল ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের অনুরূপ পুরাতন প্রতিনিধি পরিষদ। ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী রাজারা প্রায় দুইশত বৎসর এই পরিষদ আহ্বান করেন নাই।

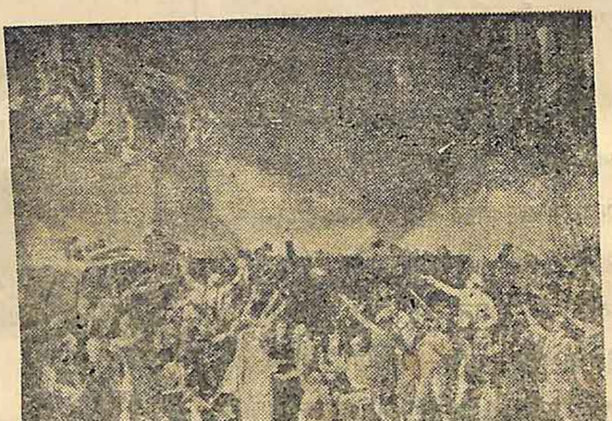


ষোড়শ লুই

পূর্বে স্টেট্‌স জেনারেল ছিল অভিজাত শ্রেণী, যাজক সম্প্রদায় এবং জনসাধারণ ("The three estates") এই তিনটি বিভাগে

বিভক্ত। দীর্ঘকাল পরে আহূত স্টেট্‌স জেনারেলে এই পার্থক্য স্বীকার করা হইল না এবং প্রতিনিধিরা উহার নাম দিলেন জাতীয় মহাপরিষদ (National Assembly)। জননেতারা শাসন সংস্কারে মন দিলেন। অভিজাত শ্রেণী ও সুবিধা প্রাপ্ত অন্যান্য শ্রেণী ভয় পাইয়া কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য রাজার উপর চাপ দিতে লাগিল।

স্টেট্‌স জেনারেলকে জনপ্রতিনিধিরা জাতীয় মহাপরিষদ বলিয়া ঘোষণা করার তিন দিন পরেই ভের্সাই রাজপ্রাসাদে তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলেন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ, সৈন্যদল



টেনিস্ কোর্টের শপথ

কক্ষ পাহারা দিতেছে এবং ঘর মেরামত করা হইতেছে বলিয়া এক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে প্রবল উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। প্রতিনিধিরা নিকটেই এক বিরাট প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া হাত তুলিয়া শপথ গ্রহণ করিলেন যে, ফ্রান্সের সংবিধান রচনা শেষ না করিয়া তাঁহারা চলিয়া যাইবেন না। উক্ত প্রাঙ্গণটি

টেনিস খেলার কোর্ট হিসাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ঐ শপথকে "টেনিস কোর্টের শপথ" বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই শপথেই ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হয়। ইহার এক সপ্তাহ পরেই রাজা নতি স্বীকার করিলেন এবং সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি জাতীয় মহাপরিষদের (বা গণ-পরিষদ) সদস্যরূপে একত্রে বসিয়া ভোট দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

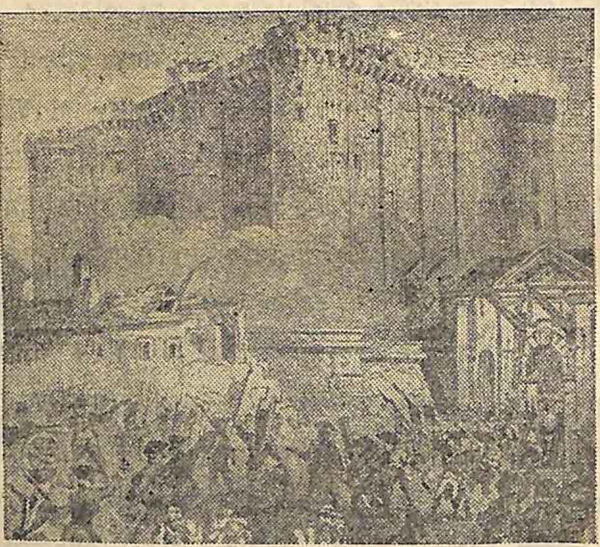
জাতীয় মহাপরিষদ বা গণ-পরিষদ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হইবার পূর্বেই আতঙ্কগ্রস্ত অভিজাত শ্রেণীর চাপে রাজা ষোড়শ লুই প্যারিস ও ভের্সাই-এর উপকণ্ঠে সৈন্য মোতায়েন করিতে আরম্ভ করিলেন। জাতীয় মহাপরিষদ বাড়াবাড়ি করিলে বল প্রয়োগ করা হইবে ইহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হইল।

বাস্তিলের পতন

মহাপরিষদ সৈন্য সরাইয়া লইবার দাবী জানাইলে রাজা দাবী অগ্রাহ্য করিলেনই, উপরন্তু তৎকালীন জনপ্রিয় অর্থমন্ত্রী নেকারকে বরখাস্ত করিলেন। প্যারিসের ক্ষুধার্ত ও বিক্ষুব্ধ জনতা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করিয়া ইহার জবাব দিল। তিন দিন ধরিয়া প্যারিসে হাঙ্গামা চলিল। তৃতীয় দিনে (১৪ই জুলাই ১৭৮৯) জনতা বাস্তিল দুর্গ অধিকার করিল। পূর্বে বাস্তিল দুর্গে রাজনৈতিক অপরাধীদের বন্দী করিয়া রাখা হইত বলিয়া বাস্তিল দুর্গ জনসাধারণের নিকট রাজার অত্যাচারের প্রতীক বলিয়া বিবেচিত হইত। এতদ্ব্যতীত বাস্তিল দুর্গের সামরিক গুরুত্বও ছিল। এই কারণেই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও অধিকারকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা বলিয়া গণ্য করা হয় এবং আজও ফ্রান্সে প্রতি বৎসর বাস্তিল দুর্গ পতনের দিনটিকে (১৪ই জুলাই) জাতীয় দিবসরূপে পালন করা হয়।

এই প্রচণ্ড অভ্যুত্থান প্রমাণ করিল যে জাতীয় মহাপরিষদকেই জনসাধারণ সমর্থন করে। বাস্তিল দুর্গ অধিকার করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত

হইল না। প্যারিসে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গণতান্ত্রিক শাসনও তাহারা গঠন করিল। প্যারিসের বিভিন্ন ওয়ার্ড বা এলাকা হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া 'কমিউন' নামে শহর শাসন পরিষদ (Town



বাস্তিলের পতন

Council) এবং নাগরিকদের লইয়া জাতীয় বাহিনী (National Guard) নামে এক সৈন্যবাহিনী গঠিত হইল। অন্যান্য শহরও প্যারিসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। দেশ জুড়িয়া পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ শুরু হইল। অভিজাত জমিদারদের দুর্গ-প্রাসাদ ও দলিল-পত্র পুড়াইয়া দিয়া কৃষকরা সামন্ততন্ত্রের শেষ চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে জাতীয় মহাপরিষদ অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা সমূহ নাকচ এবং ভূমিদাস প্রথা লোপ করিয়া গণতান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। ধর্মযাজকদের সমস্ত সুবিধা বা বিশেষ অধিকার

লোপ করা হইল। মানুষের ও নাগরিকদের অধিকারের তালিকা প্রণয়ন করিয়া এক ঘোষণা পত্র গৃহীত (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) হইল। উহার মূল নীতি হইল—স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী।

রাণী, রাজদরবারের পরিষদবৃন্দ এবং অভিজাত শ্রেণীর চাপে পড়িয়া রাজা আবার বলপ্রয়োগে জনসাধারণের আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার চক্রান্তে লিপ্ত হইলেন। ভের্সাইতে সৈন্যরা আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। রাজতন্ত্রীরা খানাপিনা করিয়া উৎসব করিলেন।

এই সংবাদ দেখিতে দেখিতে আগুনের মত প্যারিসে ছড়াইয়া পড়িল। ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দের ৫ই অক্টোবর প্যারিস হইতে ক্ষুধার্ত ও ক্রোধোন্মত্ত নারীদের এক বিরাট জনতা ১২ মাইল হাঁটিয়া ভের্সাই-এ উপস্থিত হইল। "রুটি! রুটি!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহারা রাজপ্রাসাদ ঘিরিয়া ফেলিল। লাফেইয়েতের চেষ্টায় রাজ-পরিবার রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিক্ষোভের আগুন তখন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। জনতার একাংশ শরীর-রক্ষীদের হত্যা করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল। ভীত রাজা জনতার দাবি মানিয়া লইয়া পরিবারবর্গসহ প্যারিসে উপস্থিত হইলেন। জাতীয় মহাপরিষদও প্যারিসে স্থানান্তরিত হইল।

ইহার পর ১৮ মাস অপেক্ষাকৃত শান্তিতেই কাটিল। জাতীয় মহাপরিষদ শাসন ব্যবস্থার বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করিলেন এবং ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে সংবিধান রচনা শেষ হইলে রাজা উহাতে স্বাক্ষর দিলেন। কিন্তু ষোড়শ লুই মনে মনে নূতন ব্যবস্থাকে মানিয়া লইতে পারেন নাই, অভিজাত শ্রেণীও দেশের ভিতরে ও বাহিরে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। অবশেষে রাজা সপরিবারে গোপনে প্যারিস হইতে

অভিজাত শ্রেণীর চক্রান্ত ও রাজার পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা

পলায়ন করিতে গিয়া সীমান্তের নিকটেই ধরা পড়িলেন। এই সময় হইতে "জ্যাকোবিন" বা চরমপন্থীদের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

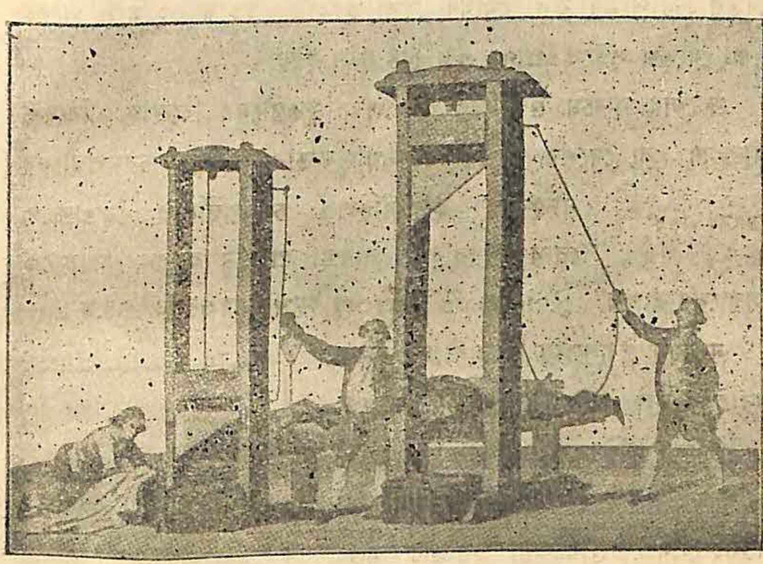
ফ্রান্সের গণজাগরণে ভীত রাজতন্ত্রী প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিলে ফ্রান্স সৈন্য অপসারণের দাবি জানাইল। অস্ট্রিয়া দাবি অগ্রাহ্য করিলে ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করিল। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর ৮০ হাজার সৈন্য ফ্রান্স আক্রমণ করিল (১৭৯২)। অস্ত্রশস্ত্র, শৃঙ্খলা ও সংগঠনের অভাবে যুদ্ধের প্রথম দিকে ফরাসীরা বার বার পরাজিত হইল। এই পরাজয়কে ফরাসী রাজপরিবারের সহিত শত্রুপক্ষের যোগাযোগের ফল মনে করিয়া জনতা বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল। ফ্রান্সের গণশক্তিকে ধ্বংস করিয়া রাজার সমস্ত ক্ষমতা ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া শত্রুপক্ষ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করার পর উত্তেজিত জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া রাজপরিবারকে বন্দী করিল।



মেরী আন্তোয়ানেৎ

দেশ-প্রেমের বন্যা

ইতিমধ্যে সমস্ত ফ্রান্সে দেশ-প্রেমের বন্যা আসিয়াছিল। দলে দলে মানুষ স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ রক্ষার জন্য মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য সংগ্রামে আত্মাহুতি দিতে অগ্রসর হইল। "মার্সে ইয়েজ" সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে স্বেচ্ছাসৈন্যরা রাজধানী রক্ষার্থে অগ্রসর হইল। এই বিশ্ববিখ্যাত বৈপ্লবিক সঙ্গীত আজও ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া পরিগণিত।



ফরাসী বিপ্লবের সময় গিলোটিন যন্ত্রে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত
ব্যক্তিদের শিরচ্ছেদের দৃশ্য

দেশরক্ষার জন্য অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ এবার চূড়ান্তভাবে রাজতন্ত্র লোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। আদর্শে অনুপ্রাণিত রণ-দুর্মদ ফরাসী দেশপ্রেমিক বাহিনীর নিকট শত্রুপক্ষ পরাজিত হইয়াছে এবং প্যারিস রক্ষা পাইয়াছে—এই সংবাদ প্যারিসে পৌঁছানো মাত্র বিপুল উল্লাসের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র লোপ করিয়া গণতন্ত্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হইল। ইহার ১২ মাস পরেই রাজা ষোড়শ লুইকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

ফ্রান্সের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে রাজতন্ত্রীদের বিদ্রোহ, বিদেশী আক্রমণ এবং দেশের ভিতর বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা চরমপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। চরমপন্থীদের নেতারূপে রোব্‌সপীয়র যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তাহাকে "সন্ত্রাসের রাজত্ব" (Reign of Terror) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

"সন্ত্রাসের রাজত্ব"

নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরোধীদের দমন করাই ছিল এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। অভিজাত পরিবারের লোক, দেশত্যাগীদের আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বহু লোককে "গিলোটিনে" প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। আনুমানিক হিসাবে জানা যায় যে প্যারিসেই প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর মৃত্যু দণ্ড হয়। মফঃস্বলেও এই ভাবে ১৫ হাজারেরও অধিক লোক চরম শাস্তি পায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারাও এই সন্ত্রাস হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। কিন্তু 'সন্ত্রাসের রাজত্বে'র নিষ্ঠুরতা, ভয়াবহতা, এবং দলাদলিকে বড়



রোব্‌সপীয়র

করিয়া দেখিলেই চলিবে না। অনেক নিরপরাধ নরনারী হয়ত ইহার ফলে নিহত হইয়াছিলেন, কিন্তু গণতন্ত্রের শত্রুরাই ইহাতে শায়েস্তা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার ফলে সারা দেশে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল, শক্তিশালী জাতীয় বাহিনী গঠিত হইয়াছিল, আভ্যন্তরীণ সমস্ত চক্রান্ত ও অভ্যুত্থান দমন করা সম্ভব হইয়াছিল, গভর্ণমেণ্টের দক্ষতা জনসাধারণের মনে আস্থা জাগাইয়াছিল।

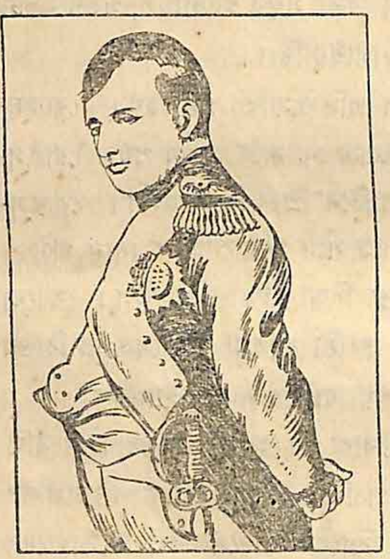
রোব্‌স্‌পীয়রের পতন

কিন্তু বাড়াবাড়ি ঘটিলে আবার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রোব্‌স্‌পীয়রের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। শেষ পর্যন্ত রোব্‌স্‌পীয়রকেও 'গিলোটিনে' প্রাণ দিতে হইল। রোব্‌স্‌পীয়রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে "সন্ত্রাসের" অবসান ঘটিল। কিন্তু তখন "সন্ত্রাসের" প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ফ্রান্সে বিপ্লব অক্ষুণ্ণ রহিল এবং বিজয়ী ফরাসী বাহিনী ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

নেপোলিয়নের অভ্যুদয়

নরমপন্থীরা ক্ষমতা লাভ করিবার পর আবার অবস্থার অবনতি ঘটিল। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও শাসন পরিচালনার ক্ষমতা নরমপন্থীদের ছিল না। বিপ্লবের আদর্শের প্রতিও তাঁহাদের অনুরাগ ছিল না। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র কোন ক্ষেত্রেই তাঁহারা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিলেন না। ইহার সুযোগ গ্রহণ করিলেন প্রতিভাশালী ও উচ্চাকাঙ্খাসম্পন্ন তরুণ যোদ্ধা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও তুরস্ক সম্মিলিত ভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিলে নেপোলিয়ন "প্রথম কন্সাল" রূপে শাসন ক্ষমতা কৌশলে হস্তগত করিলেন। নেপোলিয়ন বহু যুদ্ধে জয়ী হইয়া সমগ্র ইয়োরোপে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিলেন। প্রথম দিকে জনসমর্থন লাভের জন্য

নেপোলিয়ন জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতেন বা করিবার ভাণ করিতেন। যুদ্ধে ফ্রান্সের জাতীয় গৌরবকে উজ্জ্বল করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ন নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৮০৪)। ১৫ বৎসরকাল নেপোলিয়ন ইয়োরোপে এক বিরাট শক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। কিন্তু সম্রাট হইবার পর হইতেই তিনি আর বিপ্লবী বাহিনীর অধিনায়করূপে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন নাই। নিজের ক্ষমতা ও রাজ্য বিস্তারই তাঁহার প্রধান আকাঙ্খা হইয়া দাঁড়ায়। স্পেন, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডে এই সময়ে জাতীয়তা-বোধ প্রবল হইয়া উঠে এবং সম্রাট নেপোলিয়নের অভিযান পর পর ব্যর্থ হইতে থাকে। ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতন ঘটে এবং তিনি ইংরাজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী অবস্থায় শেষ জীবন যাপন করেন।



নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন আইন, শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে বহু সংস্কার সাধন করেন। নরমপন্থী বিপ্লবীরা যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন নেপোলিয়ন সেইগুলিই স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। নেপোলিয়নের যুগেই তাঁহার বিজয় অভিযানের

ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সারা ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়ে। পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ও নূতন সমাজ ব্যবস্থাকে পৃথক করিয়া দিয়া ফরাসী বিপ্লব এক বিরাট ব্যবধানের সীমারেখা রচনা করিয়াছে। পুরাতন ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল স্বৈরতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার। উনবিংশ শতাব্দীতে বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মানুষ যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিল তাহার ভিত্তি হইল গণতন্ত্র এবং সকল মানুষের সমান অধিকার।

বিপ্লব ফ্রান্সে শুরু হইয়াছিল বটে, কিন্তু সারা ইয়োরোপে তখন প্রায় একই ধরণের অবস্থা বিদ্যমান থাকায় বিপ্লবের ক্ষেত্র সর্বত্রই অল্পাধিক প্রস্তুত ছিল। এই কারণেই বিপ্লবের আদর্শ সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনা জাগাইয়াছিল। ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিপ্লবের ভাবধারা ইয়োরোপের সমস্ত দেশে ছড়াইতে লাগিল। "ফ্রান্স হাঁচিলে সারা ইয়োরোপে সর্দি ধরিয়া যায়"—এই কথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইল। ইয়োরোপের পরবর্তী ইতিহাস সৃষ্টির প্রধান অনুপ্রেরণা আসিল ফরাসী বিপ্লব হইতে।

অনুশীলনী

১। ফরাসী বিপ্লবের কারণসমূহ বর্ণনা কর।

২। স্টেট্‌স্ জেনারেল কাহাকে বলে এবং ষোড়শ লুই-এর আমলে কেন উহা আহূত হইয়াছিল?

৩। জাতীয় মহাপরিষদ কি ভাবে গঠিত হইল লিখ।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:—
ভলটেয়ার; রুসো; রোব্‌স্পীয়র, বাস্তিলের পতন; "সন্ত্রাসের রাজত্ব"।

৫। নেপোলিয়নের অভ্যুদয় ও অভিযান সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৬। "ফরাসী বিপ্লব পুরাতন ও নূতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধানের সীমারেখা রচনা করিয়াছিল"—ব্যাখ্যা কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শিল্প-বিপ্লব

আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার একটি উৎস ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের ফলে মধ্যযুগের সামন্ত-প্রথার চূড়ান্ত অবসান ঘটিল। নূতন সমাজ-ব্যবস্থার পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল। আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার আর একটি উৎস হইতেছে শিল্প-বিপ্লব। নূতন সমাজ-ব্যবস্থা উৎপাদনের যে নূতন প্রণালীকে ভিত্তি করিয়া পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিল, ইতিহাসে তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে শিল্প-বিপ্লব। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ডে তাহার প্রকাশ এবং পরবর্তীকালে ইয়োরোপের অন্যান্য অংশে তাহার বিস্তার ঘটে।

শিল্প-বিপ্লব মানুষের কর্মে, জীবনযাত্রায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় মূলগত পরিবর্তন আনিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের মত এই পরিবর্তনও আকস্মিক নহে, হঠাৎ একদিন ভূঁইফোড় হইয়া ইহা উঠে নাই, ধীরে ধীরে এবং নীরবে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তবে মোটামুটি বলা যায় যে ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দ হইতে এই শিল্প-বিপ্লবের প্রকৃত সূচনা হয় এবং ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দের পর অর্থাৎ শতাধিক বৎসর পরে শিল্প-বিপ্লবের বিস্ময়কর অবদান মানুষের জীবনধারাকে অনেকাংশে পরিবর্তিত করে। যন্ত্রের ব্যবহার, হাতিয়ারের পরিবর্তে কলকব্জার প্রয়োগই এই শিল্প-বিপ্লবের নূতন প্রধান বৈশিষ্ট্য। নূতন নূতন যন্ত্র যাঁহারা উদ্ভাবন করিলেন তাঁহারা জনসমাজে সুপরিচিত ছিলেন না, হৈ চৈ করিয়াও তাঁহারা কিছু করেন নাই। ধৈর্য সহকারে পূর্ববর্তী উদ্ভাবনগুলির ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করিয়া অথবা দীর্ঘকালব্যাপী

সাধনার দ্বারা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন। যন্ত্রগুলি সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী করিতেও বহু সময় লাগিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপে, বিশেষ করিয়া ইংল্যাণ্ডে এক শ্রেণীর লোকের হাতে বিপুল অর্থ জমিয়া যায়। বহির্বাণিজ্য, উপনিবেশ বিস্তার ইত্যাদির ফলে উক্ত শ্রেণীর লোক যে মুনাফা লাভ করে তাহাই ঐ অর্থ সঞ্চয়ের মূল।

আর্থিক বিকাশের দিক হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড ছিল সর্বাপেক্ষা অগ্রসর দেশ। তাই শিল্প-বিপ্লবের পূর্ণ বিকাশ ইংল্যাণ্ডেই প্রথম সম্ভব হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে রাজশক্তি মধ্যশ্রেণী বা ধনিক শ্রেণীর করায়ত্ত হইয়াছিল, তাই রাষ্ট্র সেখানে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তাই করিয়াছিল। ফ্রান্স প্রভৃতি ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে তখনও মধ্যযুগীয় সামন্ত-প্রথার অবশেষ বর্তমান ছিল এবং রাজশক্তি অভিজাত শ্রেণীর করায়ত্ত ছিল। নূতন সমাজ-ব্যবস্থার বিকাশে ইহা বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। ইহার ফলে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে শিল্প-বিপ্লব সংঘটন সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

ষোড়শ শতাব্দীতে জলদস্যু-বৃত্তি (স্প্যানিশ জাহাজ প্রভৃতি লুণ্ঠন) দাস ব্যবসায়, ভারতের সহিত বাণিজ্য, প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রভৃতির দ্বারা ইংল্যাণ্ডে এক শ্রেণীর লোকের হাতে যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল সেই অর্থ শিল্প-বিপ্লব সংঘটনে সহায়তা করিল।

শিল্প-বিপ্লবের সূচনা

ঐ সকল অর্থশালী লোক কারিগরদের নিকট হইতে জিনিস কিনিয়া নিজেরা বিক্রয় করিতে শুরু করিল। দরিদ্র কারিগররা পূর্বে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহারা নিজেরা জিনিস তৈয়ারী করিয়া নিজেরাই বিক্রয়

করিত। কিন্তু অর্থশালী ব্যক্তিরা ফড়িয়া হইয়া একসঙ্গে অনেক জিনিস তাহাদের নিকট হইতে কিনিতে থাকায় তাহাদের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা প্রয়োজন হইলে ফড়িয়াদের নিকট অগ্রিম টাকা দাদন হিসাবে পাইতে লাগিল। এইভাবে পুরাতন ক্রয়বিক্রয় ব্যবস্থার অবসান হইল এবং ক্রমে ক্রমে কারিগররা ফড়িয়াদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া পড়িল।

ফড়িয়া বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা মুনাফার বেশীর ভাগ কুক্ষিগত করিয়া আরও ধনী হইয়া উঠিল। তাহারা কারিগরদের নিজেদের বেতনভুক কর্মীরূপে নিযুক্ত করিয়া জিনিস প্রস্তুত করাইতে লাগিল। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি বসাইয়া কারখানা সমূহে বিপুল আকারে উৎপাদনের পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় এই পরিবর্তন দ্রুততর হইল।

ইংল্যাণ্ডে কিছু ব্যবসায়ী ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য তূলা ও খনি-শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে টাকা ঢালিয়া নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনে অগ্রসর হওয়ায় ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দের মধ্য ইংল্যাণ্ডের দুইটি প্রধান শিল্পে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইল। তূলাজাত বস্ত্রের শিল্পে সে যুগে ভারতই ছিল অগ্রণী। ক্যালিকো নামে পরিচিত ভারতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি পরিধান করা কেতাদুরস্ত অভিজাত মহলের মেয়েদের ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তূলাজাত বস্ত্রাদির চাহিদাই ইংল্যাণ্ডে তূলা শিল্পের প্রবর্তনের সহায়তা করে। ভারত হইতে আমদানি কমাইয়া দেশীয় শিল্পজাত বস্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য তখন ইংল্যাণ্ডে প্রবল আন্দোলনেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তখন ইংল্যাণ্ডে ভারতের ন্যায় তাঁত চরকা প্রভৃতির সাহায্যেই বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা হইত।

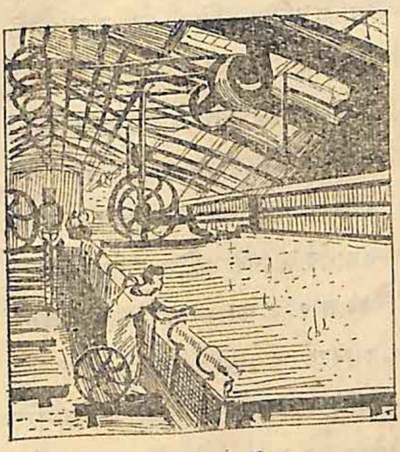
ইংল্যাণ্ডে তূলা ও খনি-শিল্পে যন্ত্র প্রবর্তন

১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে জন কে নামক একব্যক্তি উড়ন্ত মাকু (Flying Shuttle) নামে যন্ত্র চালিত মাকুর উদ্ভাবন করিলেন।

এই উদ্ভাবন ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হইল। ইহাতে তাঁতের উৎপাদন দ্বিগুণ হওয়ায় সূতার উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ আসিল। ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দে "স্পিনিং জেনী" (Spinning Jenny) নাম দিয়া হারগ্রীভ্স দ্রুত সূতাকাটার এক যন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন। আর্ক্রাইট নামক এক ব্যক্তি ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দে জলশক্তি (Water power) কাজে লাগাইয়া সূতাকাটার আর একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। হারগ্রীভ্স ও আর্করাইটের উদ্ভাবিত প্রণালী দুইটির সমন্বয় সাধন করিয়া উভয় প্রণালীর ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করিলেন ক্রম্পটন। তাঁহার যন্ত্রের নাম হইল মিউল (Mule)। ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে আর্করাইট যন্ত্র চালিত তাঁত (Power loom) উদ্ভাবন করার ফলে তূলাজাত দ্রব্যের উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইল।



হস্ত চালিত তাঁত



যন্ত্র চালিত তাঁত

ইংল্যাণ্ডে খনি হইতে কয়লা উত্তোলন এবং লৌহের আকর হইতে লৌহ উৎপাদন অনেক আগে হইতেই করা হইত। কিন্তু যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্বে কয়লা বা লোহার খুব চাহিদা ছিল না। জ্বালানীরূপে ও গৃহনির্মাণ ইত্যাদির কাজে প্রধানতঃ কাষ্ঠই ব্যবহৃত হইত। ইহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইংল্যাণ্ডের অরণ্য সমূহ প্রায় নির্মূল হইয়া যায়। আমেরিকা হইতে কাষ্ঠ আমদানি করিয়াও কুলানো যায় না দেখিয়া কয়লা ব্যবহার বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। ফলে কয়লার খনিগুলিতে উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে থাকে। কয়লার খনির ভিতর হইতে জল পাম্প করিয়া বাহির করার জন্য ১৭১২ খ্রীঃ অব্দে টমাস নিউকোমেন নামক এক ব্যক্তি "ষ্টীম ইঞ্জিন" বা বাষ্পশকট উদ্ভাবন করেন। জেম্‌স ওয়াট নিউকোমেন ষ্টীম ইঞ্জিনের ত্রুটি দূর করিয়া নূতন ধরণের এক ষ্টীম ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন। নূতন ধরণের এই ষ্টীম ইঞ্জিন দ্বারা কয়লার খনির জল নিষ্কাষণ হইতে আরম্ভ করিয়া লৌহ ও তামার খনি, কাপড়ের কল ইত্যাদির বিভিন্ন যন্ত্র পরিচালিত হইতে থাকে। কাষ্ঠ ও জলশক্তির স্থান গ্রহণ করে লৌহ ও কয়লা।


জেম্‌স ওয়াট

১৭০৯ খ্রীঃ অব্দে এব্রাহাম ডার্বি নামক জনৈক লৌহ প্রস্তুতকারক

কাঠ-কয়লার সাহায্যে লৌহ গলাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র উহার আরও উন্নতি সাধন করিয়া লৌহ গলাইবার আধুনিক প্রণালী আংশিকভাবে প্রবর্তন করেন। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে জন স্মীটন নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ার পাথুরে কয়লার দ্বারা লৌহ গলাইবার আধুনিক প্রণালী (Blast furnace) আবিষ্কার করেন।

কয়লা ও লৌহ শিল্পের বিপুল উন্নতির ফলে লৌহ ও ইস্পাত নির্মিত ছোটখাট যন্ত্রপাতি হইতে আরম্ভ করিয়া, জাহাজ পর্যন্ত সর্বপ্রকার জিনিস ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত হইতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ইংল্যাণ্ড কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ লোক তখন পল্লীগ্রামেই বাস করিত এবং মধ্যযুগের অবৈজ্ঞানিক প্রথাতেই চাষবাস হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কৃষি ব্যবস্থারও বিপুল পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। ইংল্যাণ্ডের অভিজাত শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের প্রতি মনোযোগী হইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উন্নতিতেও মন দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ব্যতিরেকে ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হইত না।

কৃষিতে পরিবর্তন

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে গম, যব প্রভৃতির রপ্তানী বাড়িতে থাকে এবং লণ্ডন নগরীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যও পল্লী অঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শস্যাদি সরবরাহ হইতে থাকে। ইহাতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে ভূম্যধিকারীদের দৃষ্টি পড়ে। হল্যাণ্ডের উন্নততর চাষের পদ্ধতি ইংল্যাণ্ডে প্রবর্তিত হয়। আগাছা নির্মূল করা ও বীজশস্যের পরিবর্তন ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। ইহাতে কৃষকদের অনর্থক এক বৎসরকাল জমি ফেলিয়া রাখিত হয় না। ইংল্যাণ্ডে এই প্রথা প্রবর্তিত হয়। গভীরভাবে লাঙল দিবার, আগাছা নির্মূল করিবার,

মাটি ভালভাবে পাট করিবার নূতন নূতন আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। নূতন নূতন চাষের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হইতে থাকে।

গৃহপালিত গো-মেষাদি জীবজন্তুর উৎকর্ষ বিধানের জন্য বেকওয়েল (১৭৭৭-৯৪) নামক এক ব্যক্তি নানা পন্থা উদ্ভাবন করেন। ইহার ফলে গো-মেষাদি পালনের পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটায় বিস্তর পতিত জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পতিত জমিতে পশু চরাইবার আর প্রয়োজন থাকে না। পূর্বে শুধু পশমের জন্য ভেড়া পোষা হইত এবং ভেড়া চরাইবার জন্য জমিতে বেড়া দিবার (enclosures) প্রয়োজন হইত। ইহার ফলে জমি হইতে উৎখাত মানুষের দুর্গতির কথা বলিতে গিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে মহামতি টমাস মূর বলেন যে, "ভেড়া যেন মানুষকে গিলিতে বসিয়াছে"। এখন বেড়া দিবার প্রয়োজন হইল বড় বড় ভূমিখণ্ডে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করিবার জন্য। এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে কৃষিতে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পুঁজি নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিল এবং যথেষ্ট পরিমাণ মুনাফা লাভের আশা থাকায় বড় বড় জমিদারেরা এই দিকে ঝুঁকিলেন, ফলে ছোট চাষাদের অসম প্রতিযোগিতায় টিকিবার কোন উপায় রহিল না। তাহারা জমিজমা বিক্রয় করিয়া দিয়া মজুরে পরিণত হইল। জমিদাররা অনেক ক্ষেত্রে জোর করিয়া জমি দখল করিলেন, সকলের ব্যবহৃত গোচর, অরণ্য সব কিছুই জমিদারদের কৃষিক্ষেত্রের সামিল হইল। বেড়া দেওয়ার আইনসমূহ ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে হইতে ক্রমাগত পাশ হইতে থাকে এবং এই সকল আইনের ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষক জমিহারা হইয়া শহরগুলিতে ভীড় করিতে থাকে। ইহাতে কারখানা মালিকদের সুবিধা হয় এবং শিল্প-বিপ্লবের উন্নতি দ্রুততর হয়।

বস্ত্র, কয়লা, লৌহ প্রভৃতি শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

বিপুল পরিমাণে বিভিন্ন পণ্য বিভিন্ন স্থানে দ্রুত প্রেরণের প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। রাস্তাঘাট ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। জন ম্যাকাডাম নামে একজন বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার রাজপথ নির্মাণের নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিলেন। খাল খনন করিয়া জলপথ সম্প্রসারিত করা হইল। জর্জ ষ্টিফেনসন নামক কয়লাখনির একজন শ্রমিক নিজের চেষ্টায় ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছিলেন। জর্জ ষ্টিফেনসন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈয়ারী করেন। তাঁহার পূর্বে রিচার্ড ট্রেভিথিক নামে এক ব্যক্তি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে ইঞ্জিন রাজপথ দিয়া যাইত। ষ্টিফেনসন রেলপথ বসাইয়া ষ্টীমইঞ্জিন চালাইবার পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে ষ্টকটন-ডার্লিটন রেলপথে প্রথম রেলগাড়ী চলে। তখন রেলগাড়ী ঘণ্টায় মাত্র ১২ মাইল বেগে চলিত। ক্রমে রেলপথ দ্রুত বিস্তার লাভ করে, ইঞ্জিনের গতিবেগও বৃদ্ধি পায়।

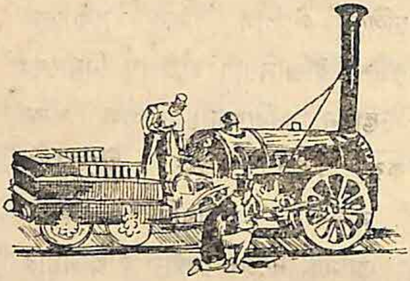
যানবাহন ব্যবস্থার ও রাস্তাঘাটের উন্নতি



ষ্টিফেনসন

জলপথে দ্রুত যাতায়াতের জন্য বাষ্পচালিত পোত (ষ্টীমার) আবিষ্কারের চেষ্টাও সাফল্যমণ্ডিত হয়। রবার্ট ফালটন নামক একজন আমেরিকান ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে ষ্টীমার তৈয়ারী করিয়া ফ্রান্সে সেন্

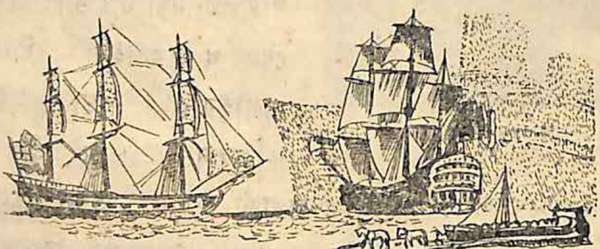
(Seine) নদীতে চালান। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার নির্মিত ষ্টীমার 'ক্লেরমণ্ট' নিয়মিত ভাবে হাডসন নদীতে চলাচল করিতে থাকে। পরে আরও অনেক প্রকার বাষ্পচালিত পোত ও জাহাজ নির্মিত হয়।



ষ্টিফেনসন নির্মিত বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন

শিল্প-বিপ্লবের ফল

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ধনীর দৌলত বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় ও অন্যান্য সর্বপ্রকার জিনিসের উৎপাদন অভাবনীয়রূপে বাড়িয়া গেল। ছোটবড় কারখানায় দেশ ছাইয়া গেল। লোকে গ্রাম হইতে উৎখাত হইয়া কারখানায় কাজ পাইবার আশায় শহরে ভিড় জমাইতে লাগিল।



পালতোলা জাহাজ এবং সেকালের অতি আধুনিক বিরাট জাহাজ

শিল্পাঞ্চলগুলি এইভাবে জনবহুল হইয়া উঠিল, বিলাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের মত শহর জাঁকিয়া বসিল।

কারখানার কাজে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। আলো-বাতাস-হীন অস্বাস্থ্যকর কারখানাগুলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একঘেয়ে কাজ করিয়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতে লাগিল। শ্রমিকদের থাকিবার বস্তিগুলিও ছিল জঘন্য। জমিহারা বহু কৃষক এবং বৃত্তিহীন বহু কারিগর মজুরে পরিণত হইয়াছিল, অপরের কারখানায় নিজের গতর খাটাইয়া অন্নবস্ত্রের চেষ্টা করা ছাড়া অন্য পন্থা ছিল না, কাজেই বেকারের সংখ্যাই ছিল বেশী। অল্প মজুরীতে ইচ্ছামত লোক নিয়োগ করিয়া মালিকরা প্রচুর মুনাফা করিত। নারী ও শিশুদের সামান্য মজুরী দিয়া নিষ্ঠুরভাবে খাটানো হইত। সেদিনকার শোষণের হৃদয়-বিদারক কাহিনী পড়িলে আজও শরীর শিহরিয়া উঠিবে। পরে যখন গরীব, মেহনতী মানুষের দল মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় তখনই এই সমস্ত অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

শিল্প-বিপ্লবের প্রথম দিকে ত্রুটি অনেক ছিল, কিন্তু ইহার জন্য শিল্প-বিপ্লবের নিন্দা করা যায় না। যন্ত্রাদি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়া মানুষ প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিতে পারিল, প্রকৃতির মুখাপেক্ষী থাকিয়া নিয়তির শৃঙ্খলে মানুষ আর বাঁধা রহিল না, মানুষের চিন্তা ও কর্মে নূতন স্বাধীনতার যুগ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতিহাসের অগ্রগতিতে ইহাই শিল্পবিপ্লবের স্মরণীয় অবদান।

অনুশীলনী

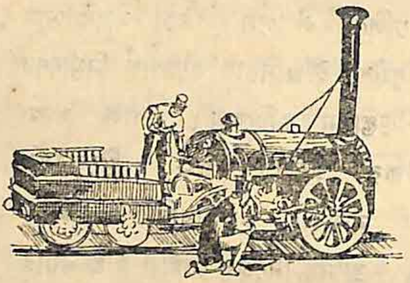
১। শিল্পবিপ্লব কাহাকে বলে? উহার কারণসমূহ বর্ণনা কর।

২। ইংল্যাণ্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব হইল কেন?

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:
(ক) স্পিনিং জেনী (খ) মিউল (গ) জেম্‌স্ ওয়াট (ঘ) ষ্টিফেনসন।

৪। শিল্পবিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা কর।

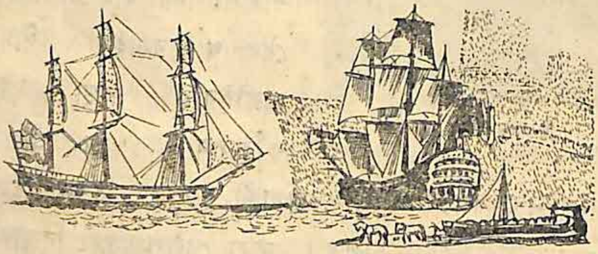
(Seine) নদীতে চালান। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার নির্মিত ষ্টীমার 'ক্লেরমণ্ট' নিয়মিত ভাবে হাডসন নদীতে চলাচল করিতে থাকে। পরে আরও অনেক প্রকার বাষ্পচালিত পোত ও জাহাজ নির্মিত হয়।



ষ্টিফেনসন নির্মিত বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ধনীর দৌলত বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় ও অন্যান্য সর্বপ্রকার জিনিসের উৎপাদন অভাবনীয়রূপে বাড়িয়া গেল। ছোটবড় কারখানায় দেশ ছাইয়া গেল। লোকে গ্রাম হইতে উৎখাত হইয়া কারখানায় কাজ পাইবার আশায় শহরে ভিড় জমাইতে লাগিল।

শিল্প-বিপ্লবের ফল



পালতোলা জাহাজ এবং সেকালের অতি আধুনিক বিরাট জাহাজ

শিল্পাঞ্চলগুলি এইভাবে জনবহুল হইয়া উঠিল, বিলাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের মত শহর জাঁকিয়া বসিল।

কারখানার কাজে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। আলো-বাতাস-হীন অস্বাস্থ্যকর কারখানাগুলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একঘেয়ে কাজ করিয়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতে লাগিল। শ্রমিকদের থাকিবার বস্তিগুলিও ছিল জঘন্য। জমিহারা বহু কৃষক এবং বৃত্তিহীন বহু কারিগর মজুরে পরিণত হইয়াছিল, অপরের কারখানায় নিজের গতর খাটাইয়া অন্নবস্ত্রের চেষ্টা করা ছাড়া অন্য পন্থা ছিল না, কাজেই বেকারের সংখ্যাই ছিল বেশী। অল্প মজুরীতে ইচ্ছামত লোক নিয়োগ করিয়া মালিকরা প্রচুর মুনাফা করিত। নারী ও শিশুদের সামান্য মজুরী দিয়া নিষ্ঠুরভাবে খাটানো হইত। সেদিনকার শোষণের হৃদয়-বিদারক কাহিনী পড়িলে আজও শরীর শিহরিয়া উঠিবে। পরে যখন গরীব, মেহনতী মানুষের দল মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় তখনই এই সমস্ত অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

শিল্প-বিপ্লবের প্রথম দিকে ত্রুটি অনেক ছিল, কিন্তু ইহার জন্য শিল্প-বিপ্লবের নিন্দা করা যায় না। যন্ত্রাদি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়া মানুষ প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিতে পারিল, প্রকৃতির মুখাপেক্ষী থাকিয়া নিয়তির শৃঙ্খলে মানুষ আর বাঁধা রহিল না, মানুষের চিন্তা ও কর্মে নূতন স্বাধীনতার যুগ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতিহাসের অগ্রগতিতে ইহাই শিল্পবিপ্লবের স্মরণীয় অবদান।

অনুশীলনী

১। শিল্পবিপ্লব কাহাকে বলে ? উহার কারণসমূহ বর্ণনা কর।

২। ইংল্যাণ্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব হইল কেন ?

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :
(ক) স্পিনিং জেনী (খ) মিউল (গ) জেম্‌স্ ওয়াট (ঘ) ষ্টিফেনসন।

৪। শিল্পবিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা কর।

নবম পরিচ্ছেদ

ইটালী ও জার্মাণীর ঐক্যসাধন

ফরাসী বিপ্লবে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। স্বাধীনতা বলিতে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র থাকা উচিত ইহাই সকলে বুঝিয়াছিল, ইহাই দেশে দেশে নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিপ্লবের এই ভাবধারা কেবল ইয়োরোপের সীমানার মধ্যে সংকীর্ণ না থাকিয়া ক্রমশঃ সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইটালী ও জার্মাণীতে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বহুকাল ধরিয়া এই দুই দেশ অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। নেপোলিয়নের বিজয় অভিযানের ফলেই উভয় দেশে প্রথম জাতীয় ঐক্যের আবেগ সঞ্চারিত হয়।

নেপোলিয়নের রাজ্যবিস্তার শুধুমাত্র এক ব্যক্তির দিগ্বিজয় হিসাবে দেখা দেয় নাই। ইয়োরোপে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার ভিত্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইতে তাঁহার অভিযান সহায়তা করে। নেপোলিয়নের অধীনস্থ ইটালীয়ান ও জার্মাণরা প্রথম কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার আস্বাদ পায়। তখনই সেখানে সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটে, বিভিন্ন ধর্মমতকে বরদাস্ত করিয়া চলার নীতি প্রচলিত হয় এবং গণতান্ত্রিক শাসনে সকল নাগরিকের সমানাধিকার সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত হয়।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ইটালী অসংখ্য নগর-রাষ্ট্র (City States) ও রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল। নেপোলিয়ন ইটালী জয় করিয়া উত্তর ও মধ্য ইটালীর ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলিকে 'এক রাজ্য পাশে' বাঁধিয়া দিলেন। দক্ষিণ ইটালীতে জোয়াকিম মুরাতের অধীনে

একটি অখণ্ড রাজ্য গঠন করা হইল। এইভাবে ইটালীতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। সামন্ততন্ত্রের ও অন্যান্য পুরাতন ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া নেপোলিয়ন নূতন নূতন সংস্কার প্রবর্তন করিলেন।

ব্রিটেন, রাশিয়া, প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও সুইডেনের সম্মিলিত আক্রমণে নেপোলিয়ন পরাজিত হইবার পর ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ ভিয়েনায় এক সম্মেলন আহ্বান (১৮১৪) করিলেন। এই সম্মেলনে (Congress) নেপোলিয়ন প্রবর্তিত সমস্ত ব্যবস্থা বাতিল করিয়া পুরাতন ব্যবস্থা-সমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হইল। কিন্তু পুরাতন ব্যবস্থা মানিয়া লইতে তখন ইটালীতে কেহই রাজী ছিল না। জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ইটালিয়ানরা প্রতিক্রিয়াশীল অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য দূর করার জন্য সংগ্রাম শুরু করিয়া দিলেন। ইটালীতে "কারবোনারী" নামে গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতি সমূহ গড়িয়া উঠিল। ইটালীয় সাহিত্যে 'রিসরজিমেণ্টো' (risorgimento) বা নব-জাগরণের জোয়ার আসিল।

১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ অব্দে আবার ইয়োরোপে বিপ্লবের ঝড় উঠিল। গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের ব্যাপক দাবি অনেক গভর্ণমেণ্টই মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। ইটালীতে সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস এলবার্ট নিয়ম-তান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতষ্ঠা করিলেন এবং ইটালীর জনসাধারণের সমর্থনে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। নূতন বা স্বাধীন অখণ্ড ইটালীর স্রষ্টা মাৎসিনি, গারিবল্ডী ও কাভুরের নাম ইতিহাসখ্যাত।

জোসেফ মাৎসিনি (১৮০৫-১৮৭২) জেনোয়ার অধিবাসী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের পুত্র। অল্প বয়সেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং 'কারবোনারী' নামে পরিচিত গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য হন। ইহার জন্য তাঁহার কারাদণ্ড হয়

এবং পরে একটি হাঙ্গামায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হয়।


জোসেফ মাৎসিনি

১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে মাৎসিনি ইটালীর মুক্তি আন্দোলন চালাইবার জন্য 'তরুণ ইটালী' নামে এক প্রকাশ্য সংগঠন গড়িয়া তোলেন। ৫০ হাজার তরুণ এই সংগঠনের সদস্য হইয়া ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন ইটালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালাইতে থাকেন। মাৎসিনির গণতন্ত্রের আদর্শ কার্যকরী না হইলেও তাঁহার আন্দোলন ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সর্বজাতির স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ রচনা আজও আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

জোসেফ গারিবল্ডী (১৮০৭-১৮৮২) মাৎসিনির সমসাময়িকদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেন। গারিবল্ডী ছিলেন নীসের (Nice) অধিবাসী। দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা ভিন্ন পথ নাই, এই চিন্তা তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার জীবন বৈচিত্র্যময়। এক যুদ্ধজাহাজে বিদ্রোহ করার অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইলে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় পলায়ন করেন এবং সেখানে 'ইটালীয়ান বাহিনী'তে (Italian legion) যোগ দিয়া ১৪ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন বৈপ্লবিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার কৃতিত্বেই

রাজতন্ত্রী ব্রাজিলের হাত হইতে উরুগুয়ের মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত হয়। দেশে ফিরিয়া তিন হাজার স্বেচ্ছাসৈন্যসহ সার্ডিনিয়ার সমর্থনে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে এবং মাৎসিনির সমর্থনে পোপের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন। পরাজিত ও ব্যর্থকাম হইয়া গারিবল্ডী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে (নিউ ইয়র্কে) আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মোমবাতি তৈয়ারী ও ব্যবসা করিয়া সামান্য অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি আবার দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় তাঁহার গুরু মাৎসিনির



গারিবল্ডী—ভিক্টর এমানুয়েল সাক্ষাৎকার। কালো ঘোড়ার আরোহী হইতেছেন গারিবল্ডী

প্রভাব হ্রাস পাইয়াছিল। মাৎসিনি বিদেশে নির্বাসিত অবস্থায় নানারূপ ব্যর্থ পরিকল্পনা ও চক্রান্ত করিয়া জীবন কাটাইতেছিলেন। সার্ডিনিয়ার রাজাকে কেন্দ্র করিয়া অখণ্ড ও স্বাধীন ইটালীর প্রতিষ্ঠার কথাই তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভাবিতেছিলেন। সার্ডিনিয়ার উদার শাসনতন্ত্র এবং অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের কথা কেহই ভুলিতে পারে নাই। দ্বিতীয় ভিক্টর এমানুয়েলের মত যোগ্য রাজা যখন সার্ডিনিয়ার রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন স্বাধীন ও অখণ্ড

ইটালী প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসিল। অভিজাতবংশীয় দেশপ্রেমিক কাউণ্ট ক্যামিলো দি কাভুর-এর (১৮১১-১৮৬১) স্থিরবুদ্ধি, দক্ষতা ও কূটনীতি স্বাধীন ও অখণ্ড ইটালীয় রাষ্ট্র গঠনে বিপুল সহায়তা করিল। গারিবল্ডী কাভুরের সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিলেন যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তখনকার অবস্থায় অবাস্তব। রাজার নিয়মতান্ত্রিক শাসনে অখণ্ড ও স্বাধীন ইটালীর প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করাই প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাজ হইবে।

কাভুর ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে সার্ডিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদও গ্রহণ করিলেন। কাভুর কারখানা স্থাপনে উৎসাহ দিয়া, শুল্ক কমাইয়া এবং রাস্তাঘাট সংস্কার ও রেলপথ প্রতিষ্ঠা করিয়া সার্ডিনিয়াকে আর্থিক দিক হইতে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত শাসন সংস্কার সকল শ্রেণীর ও মতের দেশপ্রেমিকদের সার্ডিনিয়ার পতাকাতলে সমবেত করিল। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সহিত যোগ দিয়া কাভুর সার্ডিনিয়ার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিলেন। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের পর সার্ডিনিয়া ফ্রান্সের সহিত যোগ দেওয়ায় অষ্ট্রিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইলে ফরাসী সম্রাট তাঁহার প্রতিশ্রুতি পুরাপুরি পালন না করিলেও লম্বার্ডি



কাভুর

পাওয়ায় সার্ডিনিয়ার আকার ও জনসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল অষ্ট্রিয়া পরাজিত হওয়ায় টাস্কানী, পারমা প্রভৃতি সামন্ত-রাজ্যগুলির (Duchies) পতন ঘটিল। জনসাধারণের সমর্থনে এই সকল রাজ্য সার্ডিনিয়ার অন্তর্গত হইল। দক্ষিণ ইটালীতে অত্যাচারী বুর্বোঁ রাজবংশের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে কাভুরের মৌন সম্মতিক্রমে গারিবল্ডী তাঁহার বিখ্যাত 'লাল কোর্তা' বাহিনী লইয়া বিদ্রোহীদের সমর্থনে অভিযান করিলেন। কয়েকমাসের মধ্যেই সিসিলি দ্বীপ সহ প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ইটালী তাঁহার পদানত হইল। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রোম ও ভেনিস ছাড়া সমগ্র ইটালী সার্ডিনিয়া-রাজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইল। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই মার্চ সার্ডিনিয়ার পার্লামেণ্ট ইটালীয়ান পার্লামেণ্টে রূপান্তরিত হয় এবং রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল ইটালীর রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই কাভুরের মৃত্যু হয়।

ইটালীর মত জার্মাণীও নেপোলিয়নের আক্রমণের পূর্বে অসংখ্য রাজ্য ও নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। নেপোলিয়ন প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার শক্তি হ্রাসের জন্য জার্মাণীর তিন শতাধিক রাজ্যকে এক শতেরও কম রাজ্যে পরিণত করিলেন। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে নেপোলিয়নের ইচ্ছানুসারে ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি রাজ্য লইয়া 'রাইন যৌথরাষ্ট্র' (Confederation of the Rhine) গঠিত হইল। নেপোলিয়নের শাসনাধীন জার্মাণীর বিভিন্ন অংশে সামন্তপ্রথা ও ভূমিদাস প্রথা লোপ করা হইল এবং আইনে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত হইল। বার বার নেপোলিয়নের নিকট পরাজিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রাশিয়ার চেতনা হইয়াছিল। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ প্রাশিয়া জার্মাণীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে চাহিল। ব্যারণ

ফন্ ষ্টাইন্ এবং চান্স্‌লার্ হার্ডেনবার্গ প্রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা লোপ করিলেন ; সকল শ্রেণীকে সর্বপ্রকার পেশা অবলম্বনের স্বাধীনতা দিলেন, এবং কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটাইলেন। সকল নাগরিককে কিছুকাল সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করিয়া সামরিক ব্যবস্থাকেও নূতন ভাবে গড়িয়া তোলা হইল। রাশিয়ায় নেপোলিয়নের শোচনীয় পরাজয়ের পর প্রাশিয়া সুযোগ বুঝিয়া আঘাত হানিল। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মাণীর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হইল।

নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে প্রাশিয়া শুধু নিজের হৃত রাজ্যাংশগুলিই ফিরিয়া পাইল তাহা নহে, জার্মাণীর সম্পদপূর্ণ অন্যান্য বহু অঞ্চলও প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল। অষ্ট্রিয়ার সুবিধার জন্য দক্ষিণ জার্মাণীর অবশিষ্ট ৩৮টি রাজ্য লইয়া একটি যৌথরাষ্ট্র গঠিত হইল। ঐক্যবদ্ধ জার্মাণী গঠনের স্বপ্ন কেবল আংশিক ভাবে সফল হওয়ায় জার্মাণদের মনে অসন্তোষ রহিয়া গেল।

প্রাশিয়ার রাজতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক না হওয়াতে জার্মাণদের মনে ক্ষোভ ছিল। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দের বিপ্লবের ঢেউ বার্লিনে পৌঁছাইলে অভিনয়-নিপুণ রাজা চতুর্থ ফ্রেডরিক উইলিয়াম গণপরিষদ আহ্বান করিয়া জনমতের দাবি মানিয়া লইবার ভাণ করিলেন। জার্মাণীর অন্যান্য রাজ্যেও ভীত শাসকরা রাতারাতি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। এপ্রিল মাসে সারা জার্মাণীতে নির্বাচনের পর ঐক্যবদ্ধ জার্মাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কিন্তু এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিল। ভিয়েনা ও বার্লিনে গণতন্ত্রকামী বিপ্লবীদের পরাজয়ের পর রক্ষণশীলদের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ইটালীতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে জার্মাণীতেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সার্ডিনিয়ার রাজার মতই প্রাশিয়ার রাজার

সমগ্র জার্মাণীর একচ্ছত্র রাজা হইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আবার উদারপন্থী গণতন্ত্রকামীরাও ঐক্যবদ্ধ জার্মাণীর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। উভয় পক্ষের বিরোধের মীমাংসা হইল অটো ফন বিসমার্কের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণে। বিসমার্ক গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন। প্রাশিয়ার রাজার আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার আকাঙ্ক্ষার মিল ছিল। গায়ের জোরে পার্লামেণ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া বিসমার্ক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করিলেন। কূটনীতি ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে জার্মাণীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া বিশাল জার্মাণ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। ফ্রান্সকে নিরপেক্ষ রাখার নিপুণ ব্যবস্থা করিয়া এবং ইটালীর সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। অপ্রস্তুত অষ্ট্রিয়া মাত্র সাত সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধে (১৮৬৬) পরাজিত হইয়া জার্মাণীতে সমস্ত অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। জয়ী বিসমার্ক প্রাশিয়ার সংবিধান পুরাপুরি চালু ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের হৃদয় জয় করিলেন।



বিসমার্ক

১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে বিসমার্ক সুকৌশলে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া ফ্রান্সকে পরাজিত করিলেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মাণীতে বিপুল জাতীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল। বিসমার্ক ইহাই চাহিয়াছিলেন। জার্মাণীতে উদ্দীপনার সুযোগ লইয়া তিনি দেশের অপর

রাজ্যগুলিকে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে একত্র করিয়া জার্মাণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন।

জার্মাণদের দ্বারা অধিকৃত ফ্রান্সের ভেসাই শহরে ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম 'জার্মাণ সম্রাট' বলিয়া ঘোষিত হইলেন। বিসমার্ক আরও ২০ বৎসরকাল অপ্রতিহত প্রভাবে প্রধানমন্ত্রী রূপে ঐক্যবদ্ধ জার্মাণ শাসন করেন এবং সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। আর্থিক দিক হইতে জার্মাণীকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তোলার জন্য বিসমার্ক অনেক কিছু করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাশিয়ার যে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের জন্য তিনি এত করিলেন সেই স্বৈরতন্ত্রই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে বিতাড়িত করিল। সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম নিজের অখণ্ড প্রভুত্ব অব্যাহত রাখার জন্যই বিসমার্ককে অপসৃত করিলেন। যিনি প্রাশিয়ার নবশক্তির প্রধান স্রষ্টা ছিলেন, ঐক্যবদ্ধ জার্মাণ রাষ্ট্রের যিনি ছিলেন কর্ণধার, আজীবন যিনি রাজপরিবারের সেবা করিয়াছিলেন, সেই বিসমার্কেরই পতন ঘটিল।

অনুশীলনী

১। ইটালী কি ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
২। মাৎসিনি, গারিবল্ডী ও কাভুরের সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।
৩। জার্মাণী কি ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৪। 'বিসমার্কই আধুনিক জার্মাণীর স্রষ্টা'—ব্যাখ্যা কর।
৫। বিসমার্কের সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

দশম পরিচ্ছেদ

আমেরিকায় ক্রীতদাসের মুক্তিলাভ

বহু প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীতে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষেও এই প্রথা ছিল, কিন্তু ক্রীতদাসদের প্রতি ব্যবহারে অমানুষিকতা এখানে দেখা দেয় নাই। গ্রীক সভ্যতার যুগে নাগরিক অধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত দাসের দলই সমস্ত পরিশ্রমের কাজ করিত, কিন্তু তাহারা যে মানুষ বলিয়া গণ্য নয় এমন ধারণা ছিল না, কোন কোন ক্রীতদাস নিপুণ কারিগর, শিক্ষক, হিসাবরক্ষক প্রভৃতির কাজও করিত। রোমক সাম্রাজ্যের যুগে দাস-প্রথা ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। বিজয়ী রোমানরা পরাজিত দেশের বহু লোককে বন্দী করিয়া ক্রীতদাসরূপে চাষবাস ও অন্যান্য কাজে লাগাইয়া নিজেরা বিলাসব্যসনে জীবন কাটাইতে অভ্যস্ত হয়। এই যুগে দাসদের ইচ্ছামত বাজারে কিনিতে পাওয়া যাইত। অর্থবানদের মনোরঞ্জনের জন্য সিংহের মত হিংস্র জন্তুর সঙ্গে ক্রীতদাসরা লড়িয়া মরিতে বাধ্য হইত। দাসদের নিছক জানোয়ার বা যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইত। মালিকরা খাটাইতে খাটাইতে ক্রীতদাসদের মারিয়া ফেলিতেও দ্বিধা করিত না।

আমেরিকায় ক্রীতদাস-প্রথা

রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর ইয়োরোপ হইতে ক্রীতদাসপ্রথা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়। দীর্ঘকাল পরে নূতন নূতন সমুদ্রপথ পার হইয়া আমেরিকা প্রভৃতি দেশ আবিষ্কৃত হইল এবং ইয়োরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপন শুরু হইল। তখন হইতে আবার প্রাচীন রোমের ন্যায় ক্রীতদাস-প্রথা জাঁকিয়া উঠিল। আমেরিকায় বিট ও তামাকের বাগিচাগুলিতে



মনিবের লোকেরা একজন নিগ্রো ক্রীতদাসকে চাবুকের ভয় দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে

[টম কাকার কুটীর নামক পুস্তক হইতে]

খাটাইবার জন্য লোকের দরকার ছিল। রেড্ ইণ্ডিয়ানদের জোর করিয়া এই সকল বাগিচার কাজে লাগানো হইলে অনভ্যস্ত জীবন সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা মরিয়া যাইতে লাগিল। এইভাবে আমেরিকার আদিবাসীরা শ্বেতাঙ্গদের আগমনের পর হইতে প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছে। আফ্রিকায় নিগ্রোদের (কাফ্রী) উপর তখন ইয়োরোপীয়ানদের লোলুপ দৃষ্টি পড়িল। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের একদল ব্যবসায়ী আফ্রিকার উপকূল হইতে নিগ্রোদের ধরিয়া লইয়া গিয়া আমেরিকায় ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিতে লাগিল। নিগ্রোদের বেচিয়া এই ব্যবসায়ীরা এবং তাহাদের খাটাইয়া বাগিচা-মালিকরা প্রচুর মুনাফা লুটিতে লাগিল। আধুনিক ইতিহাসে এই ক্রীতদাস-প্রথা ছিল আমেরিকা ও সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগতের কলঙ্ক।

আফ্রিকার উপকূল হইতে শ্বেতাঙ্গ বণিকের দল অকস্মাৎ আক্রমণ চালাইয়া অসহায় নিগ্রোদের পশুর মত বন্দী করিত। জাহাজে তাহাদের পশুর মতই সামান্য খাদ্য দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। নিষ্ঠুর পীড়নের ফলে এবং অর্ধাহারে অনেকে পথেই মারা যাইত। মুষ্টিমেয় মালিক অর্থের বিনিময়ে কিনিয়া লইয়া এই হতভাগ্য ক্রীতদাসদের মালিক হইয়া বসিত। মারিতে মারিতে অথবা খাটাইতে খাটাইতে ক্রীত-দাসদের মারিয়া ফেলিলেও মনিবদের কিছুই হইত না। বাস্তবিকই এই ক্রীতদাসদের পশুর বেশী মর্যাদা দেওয়া হইত না। কুকুর লেলাইয়া দেওয়া, চাবুক এবং দরকার মত বন্দুক চালানো ছিল ক্রীতদাসদের শায়েস্তা রাখিবার উপায়। মিসেস্ হ্যারিয়েট বীচার স্টো-র বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'টম কাকার কুটীরে' (Uncle Tom's Cabin) আমেরিকার তৎকালীন অবস্থার মর্মান্তিক চিত্র আঁকা হইয়াছে। ক্রীতদাসদের

ক্রীতদাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচার

সহিত বাগিচায় কিরূপ হৃদয়হীন আচরণ করা হইত, টম কাকার কাহিনী হইতেই তাহা জানা যায়। পীড়িত হইলে ক্রীতদাসদের রক্ষা ছিল না। যথেষ্ট কাজ করিতে না পারিলে নির্মমভাবে চাবুক মারা হইত। প্রহারের ফলে চেতনা হারাইলে গায় আল্‌পিন ফুটাইয়া চেতনা ফিরাইয়া আনা হইত। কেহ কাহাকেও সাহায্য করিলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। ক্রীতদাসদের শাসনে রাখার জন্য ক্রীতদাসদের মধ্য হইতেই সর্দার মনোনীত করা হইত। কেহ এই কাজ করিতে অস্বীকার করিলে মারিতে মারিতে তাহাকে হত্যা করা হইত। টাকা দিয়া যখন কিনিয়াছি, তখন ক্রীতদাসদের 'দেহ-মন আত্মা সবই মালিকের'—ইহাই ছিল মালিকদের মনোভাব।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নানা অর্থনীতিগত কারণে এবং মানবতাবোধ প্রসার লাভ করায় উইলবারফোর্স প্রভৃতি দাস ব্যবসায় ও ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিলে দাস ব্যবসায়ের অবসান ঘটে (১৮০৭) এবং ক্রমে ক্রীতদাস প্রথাও উঠিয়া যায়। ইংল্যাণ্ডই এ ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা রহিত হয়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

ক্রীতদাসপ্রথা লোপের প্রশ্ন লইয়াই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বাধে। আমেরিকা বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করার পর উত্তরাঞ্চলের স্টেট বা রাজ্যগুলি শিল্প-প্রধান হইয়া উঠে। শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যে সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির পক্ষে ক্রীতদাস প্রথার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। পক্ষান্তরে দক্ষিণাঞ্চলের স্টেটগুলি প্রধানতঃ তূলার চাষের উপর নির্ভরশীল থাকায় ক্রীতদাস প্রথাকে তাহারা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে কা র। এই ভাবে উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের

মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। পশ্চিমে অরণ্য কাটিয়া নূতন নূতন বসতি স্থাপিত হইতে থাকিলে নূতন এলাকায় কোন্ প্রথা চালু হইবে, এই প্রশ্ন উভয় অংশের মধ্যে বিরোধকে তীব্রতর করিয়া তুলে।

উত্তরাঞ্চলে ক্রীতদাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের নেতা মহামতি এব্রাহাম লিঙ্কন্ প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের বিরোধ প্রকাশ্য গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়।

এব্রাহাম লিঙ্কন্ প্রথম দিকে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া তিনি দ্রুত খ্যাতিলাভ করেন।

এব্রাহাম লিঙ্কন

"বিরোধ করিয়া একটি পরিবার টিকিতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যে, অর্ধ ক্রীতদাস এবং অর্ধ স্বাধীনভাবে এই গভর্ণমেণ্ট স্থায়ী হইতে পারে না।"—এব্রাহাম লিঙ্কনের এই বিখ্যাত উক্তিই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ধারণ করে। লিঙ্কন ছিলেন সত্যকার গণতন্ত্রকামী, তাঁহার চরিত্রবল ও চিত্তের দৃঢ়তা ছিল অসামান্য। যাহা ঠিক বলিয়া তিনি বুঝিতেন তাহার জন্য সর্বস্ব পণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন মহাত্মাকেও শেষ পর্যন্ত আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিতে হইয়াছিল।



এব্রাহাম লিঙ্কন

এব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলে দক্ষিণের রাজ্যগুলি

উত্তরের রাজ্যগুলির সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া যুক্তরাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল বলিয়া ঘোষণা করে। তাহারা সম্মেলনে মিলিত হইয়া নূতন ভাবে রাষ্ট্র গঠন করিল।

এব্রাহাম লিঙ্কন দক্ষিণের রাজ্যগুলির সম্পর্ক বিছিন্ন করার বৈধতা অস্বীকার করিলেন। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ১১ই এপ্রিল দক্ষিণাঞ্চলই যুদ্ধ শুরু করিল। প্রায় পাঁচ বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর দক্ষিণের রাজ্যগুলি পরাজয় স্বীকার করিল। গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকার সময়েই ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে এব্রাহাম লিঙ্কন ক্রীতদাসপ্রথা লোপ করিয়া ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন।

উত্তরাঞ্চলের জয়ের ফলে জাতীয় ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং নিগ্রোরা নাগরিক অধিকার লাভ করিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত নিগ্রোরা বিনা বাধায় ও শান্তিতে নাগরিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না। দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিক্রিয়াশীল শ্বেতাঙ্গরা "কু-ক্লুক্স-ক্ল্যান" প্রভৃতির ন্যায় গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া আজও নানাভাবে নিগ্রোদের উপর অত্যাচার চালাইয়া থাকে। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সমগ্র বৈষম্য দূর করার চেষ্টা চলিলেও দুর্ভাগ্যক্রমে আজ পর্যন্ত এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই।

গৃহযুদ্ধের অবসান ও বর্তমান অবস্থা

জর্জিয়া প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে এখনও নিগ্রোবিদ্বেষী নীতি প্রকাশ্যেই অনুসৃত হইয়া থাকে এবং বর্ণ-বৈষম্য এখনও আমেরিকার প্রায় সর্বত্র তীব্রভাবেই প্রকট রহিয়াছে।

অনুশীলনী

১। আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথা কি রূপ ছিল তাহা বর্ণনা কর।
২। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৩। প্রেসিডেণ্ট এব্রাহাম লিঙ্কনের পরিচয় দাও।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এশিয়া এবং আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার

সমুদ্রপথে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের যুগ হইতেই ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ উপনিবেশ স্থাপন করিতে শুরু করে। ক্রমে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া ইয়োরোপীয়দেরই আস্তানায় পরিণত হয়। ইংরাজ, ডাচ (ওলন্দাজ) ও রাশিয়ানরা যথাক্রমে ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং উত্তর ও মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

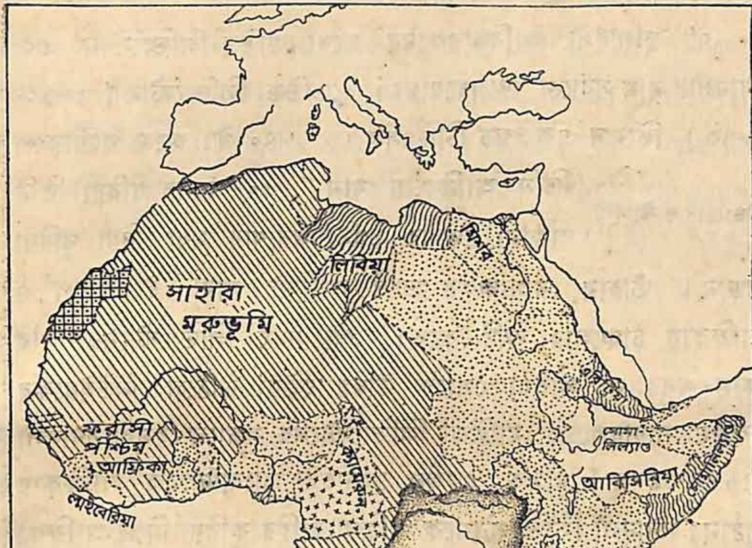
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ২৫ বৎসরে ইয়োরোপীয়দের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা চরমে উঠে এবং প্রায় সমগ্র জগতে ইয়োরোপীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্য বিস্তারে ইয়োরোপের উদ্যমকে বিশেষভাবে উৎসাহ যোগাইয়া ছিল দুইটি জিনিস। প্রথমতঃ, শিল্প-বিপ্লবের যুগে রেল, ষ্টীমার, জাহাজ প্রভৃতির আবিষ্কার ঘটায় যোগাযোগের ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পাইয়া পৃথিবী যেন পূর্বের তুলনায় ছোট হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পবিপ্লবের ফলে বাজার ও কাঁচা মালের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। বড় বড় কারখানায় উৎপাদিত রাশি রাশি মাল বিক্রয়ের জন্য বাজার চাই, আবার কারখানায় মাল উৎপাদনের জন্য চাই সস্তায় প্রচুর কাঁচামাল। ইহারই জন্য প্রয়োজন উপনিবেশের। উল্লিখিত দুইটি কারণে ইয়োরোপের ছোট বড় বহু দেশের কর্তৃপক্ষীয়েরা উপনিবেশ দখলের জন্য একরকম উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দেশ দখলের জন্য কাড়াকাড়ি হানাহানি লাগিয়া গেল। প্রত্যেকেই পশ্চাদপদ ও

দুর্বল জাতিগুলিকে শোষণ করিতে চায়, মুনাফার বখরা চায়। শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা এই যুগে এক নূতন বুলি সৃষ্টি করিলেন; 'শ্বেতকায় মানুষের বোঝা'। অনুন্নত জাতিগুলিকে উন্নত করার জন্যই তাহারা তাহাদের শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে এই মর্মে বুলি আওড়ানো সাম্রাজ্যবাদীদের ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইল।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে আফ্রিকা অজানা অন্ধকার মহাদেশ (Dark Continent) ছিল বলিলেই হয়। আফ্রিকার উপকূল ভাগের সামান্য অংশের সহিত ইয়োরোপের পরিচয় ছিল এবং সে পরিচয়ও ছিল যৎসামান্য। ভারতে যাইবার পথে জাহাজ ভিড়াইবার যায়গা হিসাবে অথবা নিগ্রোদের ধরিয়া ক্রীতদাস করার উদ্দেশ্যে আফ্রিকার উপকূলে, পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরাজ, ফরাসীরা স্থানে স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিল।

আফ্রিকার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি

পর্তুগীজ অধিকৃত মোজাম্বিক ও অ্যাংগোলা এবং ডাচ ও বৃটিশ অধিকৃত দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের কিছুটা চেষ্টা হয়। ক্রীতদাস-প্রথা উঠিয়া যাইবার পর আফ্রিকার প্রতি ইয়োরোপীয়দের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নানা কারণে। প্রথমতঃ, আফ্রিকায় উৎপাদিত কাঁচা মাল ইয়োরোপের ক্রমবর্ধমান শিল্পসমূহের চাহিদা মিটাইবে এই আশা জাগে। দ্বিতীয়তঃ, ইয়োরোপের মানবপ্রেমিকরা শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ক্রীতদাস-প্রথা রহিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না। তাঁহারা আফ্রিকায় আরব ও নিগ্রোরা যে দাস-ব্যবসায় চালাইত তাহাও বন্ধ করার জন্য এবং আফ্রিকাবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া "সুসভ্য" করার জন্য আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। সভ্যতার আলোক পাইয়া আফ্রিকা ইয়োরোপীয় শিল্পসমূহের একটি বড় বাজার হইয়া দাঁড়াইবে এই আশায় কলকারখানার ধনী মালিকরাও ইহাতে উৎসাহ


সাহারা মরুভূমি
লিবিয়া
মিশর
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা
লাইবেরিয়া
সোমালিল্যাণ্ড
আবিসিনিয়া
বেলজিয়ান কঙ্গো
জার্মান পূর্ব আফ্রিকা
জার্মান দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন
১৯১৪ সালে আফ্রিকায় সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিবর্গের অধিকৃত অঞ্চল
বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল
ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল
জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চল
ইটালির অধিকৃত অঞ্চল
পর্তুগালের অধিকৃত অঞ্চল
স্পেনের অধিকৃত অঞ্চল
বেলজিয়ামের অধিকৃত অঞ্চল

দিলেন। দুঃসাহসী অভিযাত্রী ও আবিষ্কারকদের দল অজানা দেশের রহস্য উদ্ঘাটনে অগ্রসর হইলেন।

এই দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মধ্যে ডেভিড লিভিংস্টোন এবং স্ট্যান্‌লীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ডেভিড লিভিংস্টোন (১৮১৩-১৮৭৩) ছিলেন এক স্কচ চিকিৎসক। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে পাদ্রীরূপে তিনি আফ্রিকায় যান। ৩০ বৎসর ধরিয়া তিনি অজানা দেশের দুর্গম অরণ্যের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনী সারা ইয়োরোপ ও আফ্রিকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই সময় লিভিংস্টোনের আর কোন খবর না পাইয়া লোকে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলে নিউইয়র্কের একজন সংবাদপত্রের মালিক লিভিংস্টোনের সন্ধানে হেনরী স্ট্যানলী (১৮৪১-১৯০৪) নামক একজন দুঃসাহসী সাংবাদিককে আফ্রিকায় পাঠান। স্ট্যান্‌লী লিভিংস্টোনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিজে আফ্রিকা ভ্রমণে বাহির হন। স্ট্যান্‌লীর রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনী "অন্ধকার মহাদেশে"-র ("Through the Dark Continent") অসংখ্য সংস্করণ হয় এবং স্ট্যান্‌লীর চেষ্টাতেই বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড আফ্রিকায় কঙ্গো-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

লিভিংষ্টোন ও স্ট্যান্‌লী

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ২৫ বৎসরের মধ্যেই ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ সমগ্র আফ্রিকা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লয়। সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হইলে ইয়োরোপ ও প্রাচ্যের মধ্যবর্তী সমুদ্রপথের দূরত্ব হ্রাস পায়। ইংল্যাণ্ড সুয়েজ খাল আয়ত্তে আনার জন্য মিশর ও নীল নদের সমগ্র উপত্যকা দখল করে। ইংল্যাণ্ড সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় আধিপত্য স্থাপন করে। সিসিল রোড্‌স্ নামক একজন ইংরাজ এই

আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার

ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেন। এই ব্যক্তি আফ্রিকায় হীরকের খনি হইতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া ব্রিটিশ 'দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানী' নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। নানা কৌশলে রোড্স্ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরাট এলাকা দখল করেন। পরে এই এলাকা রোডেশিয়া নামে পরিচিত হয়। সিসিল রোড্স্ প্রভৃতির চেষ্টায় নানা অজুহাতে যুদ্ধ বাধাইয়া ইংল্যাণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা দখল করে।

ফ্রান্স আফ্রিকার উত্তর উপকূলে মরক্কো হইতে তিউনিসিয়া পর্যন্ত এবং সমগ্র সাহারা মরু অঞ্চল সহ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার বিশাল এলাকা দখল করিয়া বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে জার্মাণীও একটা প্রকাণ্ড এলাকা দখল করে। বেলজিয়াম কর্তৃক কঙ্গোরাজ্য স্থাপনের কথা আগেই বলা হইয়াছে। ইটালীও আফ্রিকার পূর্ব ও উত্তর উপকূলে বিরাট উপনিবেশ স্থাপন করে।

১৯১৪ খৃঃ অব্দের পূর্বেই ইয়োরোপের শক্তিবর্গ সমগ্র আফ্রিকা গ্রাস করে। ইথিওপীয়া (আবিসিনিয়া) ও লাইবেরিয়া ছাড়া সমগ্র আফ্রিকায় কোন স্বাধীন রাজ্য বা অনাধিকৃত এলাকার অস্তিত্ব থাকিল না। লাইবেরিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত নিগ্রো ক্রীতদাসদের স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইলেও কার্যতঃ উহা মার্কিণ উপনিবেশ মাত্র।

এশিয়াতেও ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ দ্রুত সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে। আয়তন হিসাবে রুশ সাম্রাজ্যই সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে।

এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার

সমগ্র সাইবেরিয়া এবং মধ্য এশিয়া রাশিয়ার করতল-গত হওয়ায় রুশ সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল এবং পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

বিশাল চীন সাম্রাজ্যের প্রতি এই সময় ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। সেকালের উপযোগী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইয়োরোপীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা চীনের ছিল না। ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বৃটেন নানা অছিলায় চীনের সহিত যুদ্ধ বাধাইল। চীনের সম্রাটকে অনেক কুর্ণিশ করিয়া ও অনুনয় জানাইয়া ইংরাজ সে দেশে প্রবেশের অধিকার পায়। এখন ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইবার বন্দোবস্ত ইংরাজ করিল। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দের অহিফেন-যুদ্ধ নামে পরিচিত লড়াইয়ে চীন হারিয়া গেল। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দের নানকিং চুক্তি অনুযায়ী চীনের আময়, নিংপো, ফুচৌ ও সাংহাই এই চারটি বন্দরে ইংরাজ ব্যবসায়ীদেরও ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার স্বীকৃত হইল। হংকং ইংরাজদের দখলে আসিল এবং চীনকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হইল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশ নীতি অনুসরণ করিয়া চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করিল।

১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে রাশিয়া চীনের নিকট হইতে উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সমুদ্রোপকূলবর্তী আমুর জেলা কাড়িয়া লইয়া ব্লাডিভোষ্টক বন্দর স্থাপন করিল। ইতিমধ্যে জাপানও শক্তিসঞ্চয় করিয়া ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছিল। জাপান চীনের নিকট হইতে কোরিয়া, ফরমোজা (তাইওয়ান) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি কাড়িয়া লইল। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে বিশাল চীন সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধিকৃত বা প্রভাবাধীন এলাকাসমূহের সমষ্টিতে পরিণত হইল। ব্রিটেনের সহিত একযোগে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া ফ্রান্স পূর্ব এশিয়ায় এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা করিয়াছিল।

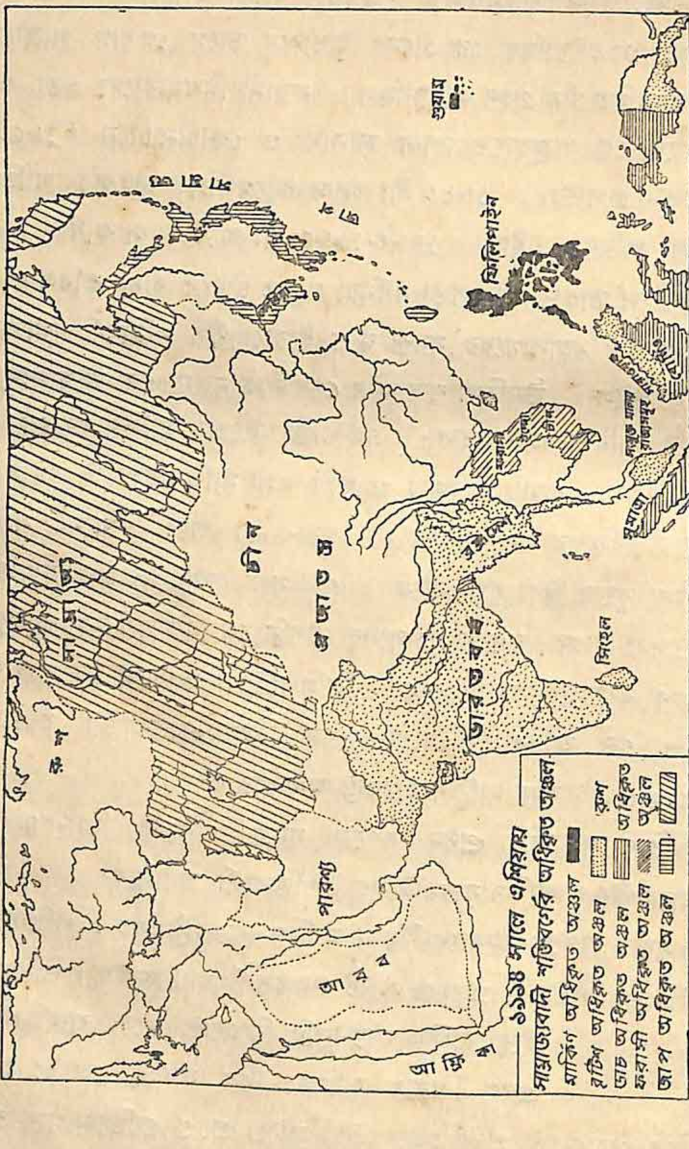
১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে তিয়েনসিন চুক্তি অনুযায়ী চীনের কয়েকটি বন্দর ফ্রান্সের প্রভাবাধীন হইয়াছিল এবং চীনের অভ্যন্তর ভাগে শ্বেতাঙ্গ পাদ্রীদের রক্ষার দায়িত্ব চীন গ্রহণ করিয়াছিল। ফরাসী মিশনারীদের হত্যা করা হইয়াছে এই অজুহাতে ফ্রান্স আনাম ও কোচীন-চীনে (১৮৫৮) অভিযান চালাইল। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে কাম্বোডিয়া ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইল। ১৮৮৩-১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ফ্রান্স কার্যতঃ সমগ্র ইন্দোচীনে তাহার আধিপত্য মানিয়া লইতে চীনকে বাধ্য করিল।

প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপ ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ ভাগাভাগি করিয়া লইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে নূতন এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। এই শক্তি হইতেছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকা। ধনেজনে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই সময় সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিয়াছে। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে স্পেনের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে স্পেন পরাজিত হয় এবং প্রশান্তমহাসাগর অঞ্চলে স্পেনের উপনিবেশ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যায়। ফিলিপাইনের আয়তন এক লক্ষ বর্গ মাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা তখন ছিল এককোটি। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জও এই সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অধিকার করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সমগ্র এশিয়ার তিন-পঞ্চমাংশ ইয়োরোপীয় (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সহ) শক্তিবর্গের অধীন হয়।

সারা জগতে ইয়োরোপীয় (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সহ) শক্তিবর্গের আধিপত্য বিস্তার ও প্রভুত্বের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ফল দাঁড়াইল। প্রথমতঃ, ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের নিজেদের মধ্যে স্বার্থ লইয়া প্রবল বিরোধ বাধিল। কে কতটা এলাকা দখল করিবে, কে কতটা প্রবল হইবে, ইহা লইয়া প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা সুরু

আধিপত্যের ফল


১৯১৪ সালে এশিয়ায়
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের অধিকৃত অঞ্চল
মার্কিণ অধিকৃত অঞ্চল
বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল
ডাচ অধিকৃত অঞ্চল
ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল
জাপ অধিকৃত অঞ্চল
রুশ অধিকৃত অঞ্চল
আরব
পারস্য
ভারতবর্ষ
সিংহল
চীন
আফ্রিকা
ফিলিপাইন
সুমাত্রা
গুয়াম

হইল। দ্বিতীয়তঃ, একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের পররাজ্য গ্রাসের স্পৃহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পাইয়া এবং অপরদিকে প্রতীচ্যের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার পরিচয় পাইয়া প্রাচ্যের পদানত মানুষও জাগিয়া উঠিল, জাতীয়তাবোধ দ্রুত বিস্তার লাভ করিল। ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের এই পারস্পরিক বিরোধই প্রধানতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য দায়ী। প্রাচ্যে জাতীয়তাবোধের প্রসার বিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার ইতিহাসে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। এ যুগেই এশিয়ার দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলন সুরু হইল। মিশর হইতে চীন পর্যন্ত স্বাধীনতার অপরাজেয় মহামন্ত্র ছড়াইয়া পড়িল।

অনুশীলনী

(১) ইয়োরোপীয়দের সাম্রাজ্যবিস্তারের কারণ কি ?

(২) আফ্রিকায় ইয়োরোপীয়দের সাম্রাজ্যবিস্তারের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(৩) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ :—

(১) লিভিংস্টোন ; (২) স্ট্যান্‌লী।

(৪) এশিয়ায় ইয়োরোপীয়দের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(৫) জগতে ইয়োরোপীয় আধিপত্যের ফল কি দাঁড়াইয়াছিল লিখ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চীন ও জাপানের জাগরণ

আধুনিক যুগের চীন ও জাপানের ইতিহাসের অনেক বিষয়ে মিল আছে, আবার পার্থক্যও আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত উভয় দেশের সহিত বহির্জগতের কার্যতঃ কোন যোগ ছিল না। ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের চাপে প্রায় একই সময় এবং একইভাবে উভয় দেশই তাহাদের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিতে বাধ্য হয়। চীনের ক্ষেত্রে ব্রিটেন এবং জাপানের ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চাপ দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছিল। কিন্তু ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের চাপের যে প্রতিক্রিয়া চীনে দেখা গিয়াছিল। ঠিক তার উল্টা প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল জাপানে। উভয় দেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ অনুসরণ করিয়াছিল।

চীনে বিদেশীদের প্রবেশ

চীনে আফিং-এর কারবার করিয়া ইংরাজ বণিকরা প্রচুর লাভ করিত। চীন সরকার আফিং আমদানি নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও ক্যাণ্টনের ইংরাজ বণিকরা ভারত হইতে আফিং আমদানি করিতে লাগিল। ইহা লইয়া কলহের সৃষ্টি হয় এবং এই অজুহাতে ব্রিটেন চীনের সহিত যুদ্ধ বাধায়। এই যুদ্ধ ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দের অহিফেন-যুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দের নানকিং চুক্তিতে যুদ্ধের অবসান হয়। চুক্তির সর্তানুযায়ী ক্যাণ্টন ছাড়াও ব্রিটেন চীনের আময়, নিংপো, ফুচৌ এবং সাংহাই বন্দরে ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ অধিকার লাভ করে, হংকং দ্বীপ ও শহর বৃটেনের অধিকারভুক্ত হয়। ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মাণী প্রভৃতি ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চীনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অঞ্চল ও বন্দরসমূহে

আধিপত্য বিস্তার করে। ক্রমে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য ইয়োরোপীয়দের হাতে চলিয়া যায়। চীনের এলাকায় ইয়োরোপীয়রা কোন অপরাধ করিলে তাহার বিচার ইয়োরোপীয়দের আদালতে হইবে—আইনের ক্ষেত্রে বিদেশীদের এই বিশেষ সুবিধা দিতে চীন বাধ্য হয়। চীনের সমুদ্রোপকূলবর্তী সমস্ত সমৃদ্ধ বন্দরে এবং চীনের অভ্যন্তর প্রদেশেও ইয়োরোপীয়রা কলকারখানা স্থাপন করিতে থাকে, ব্যবসা বাণিজ্যে কার্যতঃ ইয়োরোপীয়দের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পাদ্রীরা বিনা বাধায় খৃষ্টধর্ম প্রচারের সুযোগ লাভ করে। বিদেশীদের রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব চীন সরকারকে গ্রহণ করিতে হয় এবং আত্মরক্ষার অজুহাতে চীনের রাজধানী পিকিং-এ পর্যন্ত বিদেশীরা ফৌজ মোতায়েন রাখার অধিকার লাভ করে।

ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইতিমধ্যে জাপান প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দেশে কলকারখানা গড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরাও উপনিবেশ বিস্তারে উন্মুখ হইয়া উঠিল। দুর্বল প্রতিবেশীদের উপর তাহার লুব্ধ দৃষ্টি পড়িল এবং নানা কৌশলে যুদ্ধ বাধাইতে বিলম্ব হইল না। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ অব্দের চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। সন্ধিসর্ত অনুযায়ী জাপান কোরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের অধিকার পাইল এবং ফরমোজা (তাইওয়ান) দ্বীপ দখল করিল। চীনের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মাণী একযোগে জাপানের প্রভুত্ব বিস্তারে বাধা দিতে অগ্রসর হইল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে রাশিয়া পোর্ট আর্থার সহ লিয়াওটুং উপদ্বীপ "ইজারা" (কার্যতঃ দখল) লইল এবং মাঞ্চুরিয়াতে অসংখ্য সুবিধা আদায় করিল। জার্মাণী কিয়াংওচৌ বন্দর এবং শানটুং প্রদেশে, ফ্রান্স হাইনান দ্বীপ, কোয়াংসি ও য়ুনান প্রদেশ এবং

কোয়াংচৌ বন্দরে এবং বৃটেন কোওলুন উপদ্বীপ, উইহাইউই বন্দরে এবং সমগ্র ইয়াংসি উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার করিল।

চীনে এই সময়ে মাঞ্চুরাজবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন। ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট বার বার পরাজিত ও অপমানিত হইয়াও মাঞ্চুরাজবংশ কিছুই শিখিলেন না। পুরাতন কায়দায় বিলাস ও আড়ম্বরবহুল জীবন যাত্রা অব্যাহত রহিল। সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরাতন ব্যবস্থাই বহাল রহিল। কিন্তু বিদেশীদের নিকট বার বার পরাজয় চীনাদের মনে আধুনিক পন্থায় নিজেদের শক্তিশালী করিয়া তোলার বাসনা জাগাইয়াছিল। ইহারই ফলে চীনের সম্রাট কুয়াংসু (১৮৭৫-১৯০৮) পাশ্চাত্ত্য কায়দায় শাসন ও শিক্ষা বিভাগের সংস্কারের জন্য কয়েকটি আদেশ জারি করিলেন। কিন্তু তাঁহার বালক বয়সের অভিভাবিকা মাসি তু-সি প্রতিক্রিয়াশীল সেনাপতি ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সম্রাটের সংস্কার-প্রচেষ্টার বিরোধিতা করিলেন। সম্রাট কার্যতঃ বন্দী হইলেন এবং মাসির অভিভাবকত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৯০২ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত তু-সিই চীনে রাজত্ব করেন। পাশ্চাত্ত্যের কিছুই তু-সির নিকট গ্রহণের অযোগ্য ছিল। বিদেশীরা 'বর্বর' ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। বিদেশীদের আধিপত্য বিস্তারে বিক্ষুব্ধ চীনাদের বিক্ষোভ এই সময় বিদেশী নিধন আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। "ন্যায়বান, দেশপ্রেমিকদের মুষ্টি" নামে একটি চীনা সংগঠন 'বিদেশী শয়তান' বিতাড়নের জন্য আন্দোলন সুরু করিয়া খ্রীষ্টান পাদ্রী ও ধর্মান্তরিত চীনাদের খুন করিতে ও বিদেশীদের সম্পত্তি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিতে থাকে। ইংরাজীতে উক্ত চীনা সংগঠনের নাম হয় "বক্সার" বা মুষ্টি যোদ্ধা এবং বিদেশী বিরোধী আন্দোলন

বিদেশী আধিপত্যে চীনের প্রতিক্রিয়া

'বক্সার আন্দোলন বা বিদ্রোহ' নামে পরিচিত হয়। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে চীনের সমস্ত বড় বড় শহরে, বিশেষ করিয়া পিকিং-এ এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। পিকিং-এ জার্মাণ দূত নিহত হন এবং সমস্ত বিদেশীর জীবন বিপন্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিটেন, রাশিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মাণী ও জাপানের সম্মিলিত বাহিনী পিকিং অভিযান করে। চীনা সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয় এবং ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে তু-সি অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিত্রশক্তিবর্গের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য হন। 'বিদেশী শয়তান' বিতাড়ন আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করা হয়। ঠেকিয়া শিখিয়া তু-সি কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাতন ব্যবস্থার কিছুটা সংস্কার করেন। চীনা ছাত্রদের বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্ত্যে কি ধরণের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহা জানিবার জন্য একটি কমিশনও বিদেশে পাঠানো হয়।

সুন-ইয়াৎ-সেন

বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যে সকল চীনা যুবক দেশে ফিরিলেন তাঁহারা দেশপ্রেম ও গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন। এই যুবকদলের নেতা ছিলেন সুন-ইয়াৎ-সেন।

সুন-ইয়াৎ-সেন স্বল্পবিত্ত ঘরের ছেলে। পরে তিনি চিকিৎসক হন। প্রায় সারা জীবন বিদেশে নির্বাসিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইলেও সুন-ইয়াৎ-সেন চীনের নবজাগ্রত জনসাধারণের অবিসম্বাদী নেতারূপে চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং তাঁহার দেশপ্রেম ও গণতন্ত্রের ভাবধারা সারা চীনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।

সুন-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনে যুগপৎ মাঞ্চু রাজবংশ এবং পাশ্চাত্ত্যের বিদেশী শক্তিবর্গের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিরাট

গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের বিপ্লবের ফলে মাঞ্চু রাজবংশের শাসনের অবসান হয় এবং সুন-ইয়াৎ-সেনকে প্রেসিডেন্ট করিয়া একটি অস্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়। প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রধান শত্রু ছিল তিনটি—আভ্যন্তরীণ অনৈক্য, বিদেশী কায়েমী স্বার্থ এবং জাপানীদের আক্রমণ। য়ুয়ান শি কাই নামক একজন চীনা সেনাপতিকে প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রেসিডেন্ট পদে বসাইয়া সুন-ইয়াৎ-সেন অন্যান্য কাজে মন দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু য়ুয়ান শি কাই-এর আকাঙ্ক্ষা ছিল চীনের সম্রাট হইবার; ফলে অল্পকালের মধ্যেই সুন-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত কুওমিনটাং দলের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিল। য়ুয়ান শি কাই ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলে কুওমিনটাং সশস্ত্র প্রতিরোধে অগ্রসর হয়। য়ুয়ান শি কাই-এর মৃতুতে বিরোধের অবসান হইল। ইতিমধ্যে চীন প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের সহিত (অর্থাৎ জার্মাণী এবং অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর বিরোধী ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শক্তিবর্গের সহিত) যোগ দেয়। ইহাতে চীনের কোন লাভই হয় না।



সুন-ইয়াৎ-সেন

য়ুয়ান শি কাই-এর মৃত্যুর পরও চীনের আভ্যন্তরীণ বিরোধ চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে সুন-ইয়াৎ-সেন তিনটি মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া কুওমিনটাং দল পুনর্গঠিত করেন। ইহার ফলে কুওমিনটাং

পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়। চীনের আভ্যন্তরীণ বিরোধের অবসানের জন্য এই সময় হইতে ব্যাপক প্রচেষ্টা সুরু হয়। চীনে এই সময় প্রজাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব ক্যাণ্টনকে কেন্দ্র করিয়া প্রধানতঃ দক্ষিণাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। এক একজন যোদ্ধা-শাসক (War-Lord) এক এক অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজেদের সারা চীনের 'রাষ্ট্রপতি' বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকেন। পিকিং-এ স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়। এই গভর্ণমেণ্টের সমর্থকদের সহিত একটা মীমাংসা করিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য যখন সুন-ইয়াৎ-সেন চেষ্টা করিতেছেন তখন পিকিং-এ তাঁহার মৃত্যু হয় (১৯২৫)।

চিয়াং-কাই-শেক এবং কুওমিনটাং-কমিউনিস্ট বিরোধ

সুন-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর কুওমিনটাং বাহিনী ও দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন চিয়াং কাই-শেক। সুন-ইয়াৎ-সেন কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় কাজ করার নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। চীনের কমিউনিস্টদের সহায়তায় সমস্ত যোদ্ধা-শাসকদের পরাজিত করিয়া সুন-ইয়াৎ-সেন সমগ্র চীনকে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের শাসনাধীন করেন।

সুন-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কুওমিনটাং দলের সহিত কমিউনিস্টদলের প্রবল বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং চিয়াং কাই-শেক কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতি নিদারুণভাবে অনুসরণ করিতে থাকেন। ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিয়া চিয়াং কাই-শেক চীনে সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। কমিউনিস্ট দলের প্রভাব ও শক্তি কম ছিল না। তাহারা চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আন্দোলন

চালাইতে থাকে। দশ বৎসর ধরিয়া চীন নিদারুণ অন্তদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইতে থাকে। ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জাপান আবার আক্রমণের নীতি অনুসরণ করিতে সুরু করে।

১৯৩১ খ্রীঃ অব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া কাড়িয়া লয়। ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দে চীন ও জাপানের মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ বাধিলে সমগ্র চীনে দেশাত্মকবোধের প্লাবন আসে। দেশের স্বার্থে কমিউনিস্টরা পরম শত্রু চিয়াং কাই-শেকেরও সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চায়। জনমতের চাপে চিয়াং কাই-শেক সকল দলের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া দেশরক্ষা করিতে সম্মত হন ৷ ঐক্যবদ্ধ চীন প্রাণপনে জাপানকে বাধা দিতে থাকে। ১৯৪২ খ্রীঃ অব্দে জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করিলে চীন মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। এইভাবে চীনের দেশরক্ষার যুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রবল স্রোতের সহিত মিশিয়া যায়!

চীনের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ



চিয়াং কাই-শেক

চীনের ন্যায় জাপানেরও বহির্জগতের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না বলিলেই হয়। জাপানের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় 'সামুরাই' (আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষত্রিয়দের অনুরূপ) ও অভিজাত বংশীয়দের ছিল অখণ্ড প্রতাপ। মিকাডো বা সম্রাট সূর্যদেবের বংশধর বলিয়া দেবতারূপে পূজিত হইতেন এবং শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন তাঁহার প্রধান রাজকর্মচারী 'শোগুন'। এই পদ ছিল বংশানুক্রমিক।

বিদেশীদের আগমনের পূর্বে জাপানের অবস্থা

যখন যে সামন্ত রাজা প্রবল হইতেন তিনিই 'শোগুন' পদ লাভ করিতেন। জাপানে এই সকল সামন্ত রাজাদের বলা হইত 'দেইমিও'। 'সামুরাই' ও অভিজাতবংশীয়রা ছিলেন জনসাধারণের শতকরা মাত্র ৫ জন, কিন্তু জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির তাঁহারাই ছিলেন মালিক।



সামুরাই

ষোড়শ শতাব্দী হইতে পর্তুগীজরা জাপানে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে থাকে। জাপানে খৃষ্টধর্মও কিছুটা প্রসার লাভ করে জাপানের সামন্ত রাজারা ইহাতে বিচলিত হইয়া বিদেশী পাদ্রীদের জাপান ত্যাগ করার আদেশ দেন এবং ১৬৩৮ খ্রীঃ অব্দে খ্রীষ্টধর্ম জাপানে নিষিদ্ধ হয়। বিদেশীদের জাপান প্রবেশ কার্যতঃ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং জাপানীদের বিদেশ যাত্রা নিষিদ্ধ হয়। বিদেশীদের সহিত বাণিজ্যসম্পর্কও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৬৩৮ হইতে ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ এই দুই শতাধিক বৎসর পাশ্চাত্ত্যের সহিত জাপানের কোন সম্পর্কই থাকে না। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে মার্কিণ পতাকা উড়াইয়া একটি জাহাজ জাপানের উপকূলে ভিড়িলে গোলা বর্ষণ করিয়া জাহাজটিকে বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে বিধ্বস্ত

একটি মার্কিণ জাহাজের নাবিকদের সন্ধানে আর একটি মার্কিণ জাহাজ জাপানে উপস্থিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে চারটি মার্কিণ যুদ্ধ-জাগাজ লইয়া কমোডোর পেরী জাপানের নিষিদ্ধ সমুদ্রে নোঙ্গর ফেলিলেন। বিশালকায় কামান ও বাষ্পচালিত জাহাজ দেখিয়া জাপানীরা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। পেরী জাপানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা দাবি করিলেন। তৎকালীন শোগুন দাবি মানিয়া লইয়া দুইটি বন্দরে মার্কিণ বণিকদের ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা দিলেন (১৮৫৪)। জাপানে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইল। রাশিয়া, হল্যাণ্ড ও ব্রিটেন ক্রমে ক্রমে বলপ্রয়োগে জাপানের নিকট হইতে বহু সুবিধা আদায় করিয়া লইল।

আধুনিক জাপানের অভ্যুদয়

নিজেদের দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া অপমানিত ও বিক্ষুব্ধ জাপানীরা পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে জাপানকে শক্তিশালী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। 'দেইমিও' বা সামন্ত রাজারা 'শোগুনের' কর্তৃত্বের অবসান ঘটাইয়া মিকাডো বা সম্রাটের নেতৃত্বে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য আন্দোলন সুরু করিলেন। ইহারই ফলে জাপানে ১৮৬৭-৬৮ খ্রীঃ অব্দের বিপ্লব সংঘটিত হইল। তৎকালীন শোগুন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং মুৎসিহিটো শাসনক্ষমতাসম্পন্ন সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। সমস্ত রাজারা স্বেচ্ছায় সম্রাটের হাতে তাঁহাদের সমস্ত অধিকার ও সম্পত্তি অর্পণ করিলেন। ইহার বিনিময়ে নূতন অভিজাত শ্রেণীরূপে সামন্ত রাজারা শাসনব্যবস্থায় যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করিলেন। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে সামন্ততন্ত্রের লোপ করিয়া আদেশ জারি করা হইল। সম্রাট মুৎসিহিটোর (১৮৬৭-১৯১২) রাজত্বকালে অতি দ্রুত আধুনিক সংস্কার প্রবর্তন করিয়া জাপান প্রায় রাতারাতি সামরিক, রাজনৈতিক ও

শিক্ষার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। এই সময়ের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যে জাপান সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক শিল্পে জাপান দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল, জাপানের স্থল ও নৌবাহিনী সম্পূর্ণ আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত হইয়া দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিয়া জাপানী যুবকরা নূতন করিয়া দেশকে গড়িয়া তুলিলেন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিপুল প্রসার ঘটিল। জাপানে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল।



রাজ পরিচ্ছদে জাপ সম্রাট

জাপান পাশ্চাত্ত্যের নিকট হইতে শুধু আধুনিক সামরিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সংক্রান্ত পদ্ধতিগুলি আয়ত্ত করিল না, সাম্রাজ্যবাদের পদ্ধতিগুলিও অনুসরণ করিতে শিখিল। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার প্রতি তাহার লুব্ধ দৃষ্টি পড়িল। চীনের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া জাপান কোরিয়া কুক্ষিগত করিল। জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত রাশিয়াও চীনের পোর্ট আর্থার প্রভৃতি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি দখল করিলে জাপান শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হইল। ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে রুশ-জাপ যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় সারা জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এশিয়ার একটি শক্তির নিকট আধুনিক যুগে ইয়োরোপীয়

শক্তির এই প্রথম পরাজয় এশিয়াতেও বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। পোর্ট আর্থার বিজয়ী জাপান বৃহৎ শক্তিরূপে পরিগণিত হইল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জাপান সুযোগ বুঝিয়া চীনের নিকট ২১ দফা দাবি পেশ করিল (১৯১৫)। জাপান সমস্ত দাবি আদায় করিতে না পারিলেও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় শৃঙ্খলা রক্ষার অধিকার এবং চীনে বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত বহু অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করিয়া লইল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওয়াশিংটনে নৌশক্তিগুলির এক সম্মেলন হয় (১৯২১-২২)। ব্রিটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালী এই সম্মেলনে যোগ দেয়। কাহার কতটা যুদ্ধ-জাহাজ, সাবমেরিণ প্রভৃতি থাকিবে তাহাই এই সম্মেলনে স্থির হয়। জাপান এই সম্মেলনে সুবিধা করিতে পারে নাই। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দে জাপান আবার চীন আক্রমণ শুরু করে। চীনে যে জাতীয় প্রতিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রধানতঃ তাহারই ফলে জাপানের চীন জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

ওয়াশিংটন সম্মেলন

অনুশীলনী

(১) চীনে এবং জাপানে বিদেশী শক্তিবর্গ কি ভাবে প্রবেশ করিল বর্ণনা কর।

(২) চীনে 'বিদেশী শয়তান' বিতাড়ন আন্দোলন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

(৩) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে যাহা জান লিখ :—

(১) সুন ইয়াৎ-সেন, (২) চিয়াং কাই-শেক, (৩) কমোডোর পেরী।

(৪) "গণতান্ত্রিক চীনের তিনটি প্রধান শত্রু হইল, আভ্যন্তরীণ অনৈক্য, বিদেশী কায়েমী স্বার্থ ও জাপ আক্রমণ"—ব্যাখ্যা কর।

(৫) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যাহা জান লিখ :—

(১) ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের চীন বিপ্লব। (২) শোগুন, (৩) মিকাডো, (৪) সামুরাই, (৫) রুশ-জাপ যুদ্ধ, (৬) ওয়াশিংটন সম্মেলন।

(৬) চীনে জাপানের আক্রমণ ও ব্যর্থতার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েট ইউনিয়ন

১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে রাশিয়ায় যে বিপ্লব ঘটে, তাহার প্রভাব মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে একমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবের সহিতই তুলনীয়। যে কয়েকটি ঘটনা মানুষের ইতিহাসে প্রকৃতই যুগান্তর আনিয়াছে, রুশ বিপ্লব সেগুলির মধ্যে অন্যতম।

এই বিপ্লব কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। ইয়োরোপে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে এক নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই ভাবাধারাকে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়াছিলেন জার্মাণ মনীষী কার্ল মার্ক্‌স্। মার্ক্‌স্ মাতৃভূমি হইতে নির্বাসিত হইয়া ইংল্যাণ্ডেই স্থায়ীভাবে বাস করেন। তখন ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের যুগ চলিতেছিল। মার্ক্‌স্ ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন "যে উৎপাদন ও সমাজের সমৃদ্ধি যাহাদের পরিশ্রমের ফল, সেই শ্রমিকরাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত হইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করিবে।" কলকারখানা স্থাপন করিয়া শিল্প পরিচালনার মত বিপুল অর্থ যে স্বল্প সংখ্যক লোকের হাতে থাকে তাহাদেরই বলা হয় ধনিক বা পুঁজিপতি। বর্তমান সমাজে এই ধনিক বা পুঁজিপতি শ্রেণীই আধিপত্য



কার্ল মার্ক্‌স্

করিয়া থাকে, কারণ সমাজে এই শ্রেণীই আজ সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্য স্থাপিত হইলে ব্যক্তিগত সম্পদের জোরে কেহ কাহাকে শোষণ করিতে পারিবে না, মালিক-শ্রমিক বিরোধের অবসান ঘটিবে, সমাজের ঐশ্বর্য সমগ্র সমাজেরই সম্পত্তি হইবে।

রাশিয়ায় কার্ল মার্ক্স্-এর এই মতবাদ দ্রুত প্রভাব বিস্তার করিল। ইহার কারণও ছিল। পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় রাশিয়াই ছিল অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ। রাশিয়ায় ভূম্যধিকারীরাই আধিপত্য করিতেন এবং রাশিয়ার 'জার বা সম্রাট ছিলেন ভূম্যধিকারী শ্রেণীরই শিরোমণি। জার সৈন্যবাহিনী ও গোয়েন্দা পুলিশের সাহায্যে নিরঙ্কুশ শাসন চালাইতেন। রুশ জনসাধারণের অংধিকাশই ছিল দরিদ্র ও নিরক্ষর কৃষক। শিল্প ছিল অনুন্নত; যাহাও বা ছিল তাহাতে টাকা খাটিত প্রধানতঃ বিদেশীদের। শ্রমিকরা চরম দুর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করিত। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাষ্ট্রশাসনে অংশ গ্রহণ করিতে না পারায় জারের নির্মম ও দায়িত্বহীন শাসনের বিরোধী ছিল। ইয়োরোপের অগ্রগামী দেশগুলির নূতন নূতন ভাবধারা এই শিক্ষিত শ্রেণীর মনে প্রবল আলোড়ন তুলিয়াছিল। ইহারই ফলে জারতন্ত্রের অবসান ঘটাইবার জন্য রাশিয়ায় বহু রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিল। জারের অত্যাচার ও দমন নীতিও এই সময়ে চরমে উঠে। সন্ত্রাসবাদী, গণতন্ত্রী, সমাজ-তন্ত্রবাদী কেহই জারের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না।

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রী মহলে এক অসাধারণ প্রতিভাশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার আবির্ভাব হয়। লেনিন নামে সুপরিচিত এই নেতার আসল নাম ছিল ভাডিমির ইলিচ উলিয়ানোভ (১৮৭০-১৯২৪)। লেনিন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম

গ্রহণ করেন। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হন।



লেনিন

লেনিনের নেতৃত্বে কার্ল মার্ক্‌স্‌-এর মতানুসরণকারী বিভিন্ন ছোট ছোট দল একটি সংঘবদ্ধ বৃহৎ দলে পরিণত হয়। অধিকাংশ সময় আত্মগোপন করিয়া বিদেশে থাকিয়া লেনিনকে আন্দোলন পরিচালনা করিতে হইয়াছে। লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতন্ত্রবাদী দল শেষ পর্যন্ত বল্‌শেভিক দল নামে পরিচিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আন্দোলন, ১৯০৫ সালের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান, ইত্যাদির ফলে জারতন্ত্রকে কিছুটা পরাজয় স্বীকার করিতে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণের দাবি অল্প পরিমাণে মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু অবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন না ঘটায় অসন্তোষ ও বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। ইতিমধ্যে পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জাপানের নিকট পরাজয়ের (১৯০৫) ফলে জারতন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে। দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। সন্ত্রস্ত রুশ সম্রাট নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দাবি মানিয়া লইয়া "ডুমা" বা প্রতিনিধি-সভা স্থাপন করেন। কিন্তু বিক্ষোভ হ্রাস পাওয়া মাত্র "ডুমার" সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হয়। ইহাতে সারা দেশে অসন্তোষের আগুন উঠিতে থাকে। দুর্বল ও অকর্মণ্য জারতন্ত্রের পতন আসন্ন হইয়া উঠে।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। রাশিয়া ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্রশক্তির সহিত যোগ দিয়া জার্মাণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কুশাসন-পীড়িত রাশিয়ায় জনসাধারণের বিক্ষোভের চাপা আগুন ধূমায়িত হইতেছিল। সরকারী অক্ষমতা, অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতির ফলে যুদ্ধে বার বার রাশিয়ার পরাজয় ঘটে, লক্ষ লক্ষ সৈন্য প্রাণ হারায় এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতির ফলে দেশে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয়।

খাদ্যাভাবের ফলে বড় বড় শহরে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ ভাবে ধর্মঘট করিয়া অচল অবস্থার সৃষ্টি করে। রণক্লান্ত, অসন্তুষ্ট সৈন্যরাও জনসাধারণের সহিত যোগ দিয়া জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে পেট্রোগ্রাডে সৈন্যরা শ্রমিকদের উপর গুলি চালাইতে অস্বীকার করার পর বিদ্রোহ সারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারই ফলে জারতন্ত্রের পতন হয়। "ডুমা" বা প্রতিনিধিসভার একটি কমিটি শাসন ভার গ্রহণ করিলে জার সিংহাসন ত্যাগ করেন। ইতিহাসে ইহা ১৯১৭ সালের মার্চ-বিপ্লব বলিয়া অভিহিত হয়।

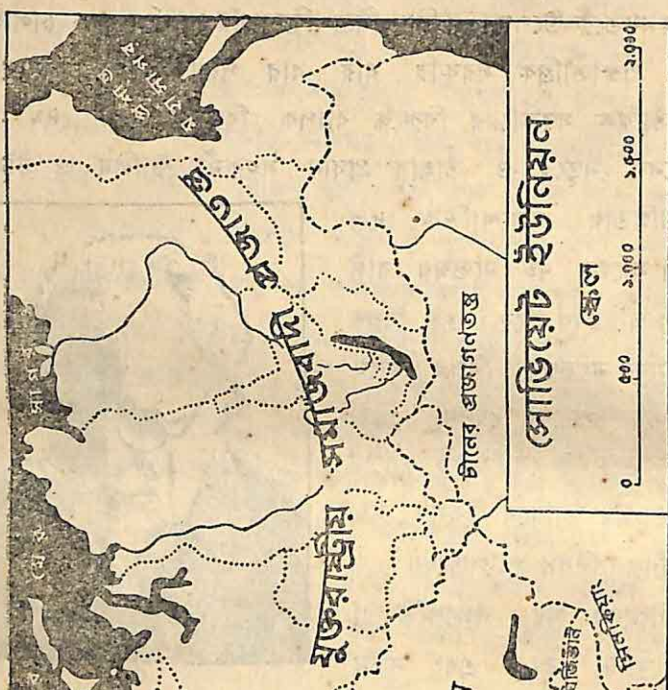
নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রকামীরা অনেক আশা করিলেও রাশিয়ায় প্রজাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের শান্তি, খাদ্য ও জমির দাবি মিটাইতে পারিল না। ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্রবাদী বামপন্থী দলগুলি শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের সংঘবদ্ধ করিয়া শহরে ও গ্রামে "সোভিয়েট" বা স্থানীয় পঞ্চায়েৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সকল সোভিয়েটের মাধ্যমেই জনসাধারণের অসন্তোষ প্রকাশ পাইল। লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিক দল জনসাধারণের দাবি প্রচার ও সমর্থন করিয়া সোভিয়েটগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইল। এই বলশেভিক দলই পরে কমিউনিস্ট দল বলিয়া পরিচিত হয়

জনমতকে উপেক্ষা করিয়া মিত্রশক্তিবর্গের সমর্থনে যুদ্ধ চালাইতে গিয়া প্রজাতান্ত্রিক সরকার বার বার পরাজিত হয়। ব্যর্থকাম প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং লেনিনের নেতৃত্বে ও তাঁহার প্রধান সহকর্মী স্টালিন ও ট্রট্স্কির সহযোগিতায় বলশোভিক দল ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করে। এই বিপ্লব ইতিহাসে নভেম্বর বিপ্লব নামে বিখ্যাত। ফ্রান্সে যেমন ১৪ই জুলাই, তেমনই সোভিয়েট দেশে ৭ই নভেম্বর তারিখে উৎসব হয় এবং বিপ্লব দিবস পালিত হয়।



ট্রট্স্কি

বিপ্লবের পর বলশেভিকরা শান্তি স্থাপন করে এবং নূতন ভিত্তিতে রুশ রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করে। ক্রমশঃ ১৯২৪ সালে এশিয়া ও ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট রাষ্ট্রগুলি "ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোশালিষ্ট রিপাবলিক্স" ("ইউ. এস. এস. আর.") বা সোভিয়েট সমাজ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমূহের সংঘ নামে সংগঠিত হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্ম হইতে না হইতেই ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি বহু রাষ্ট্র সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বিরাট সামরিক অভিযান সুরু করে। দেশের মধ্যেও ক্ষমতাচ্যুত শাসক ও ধনী শ্রেণী নানাস্থানে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। দেশব্যাপী উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লেনিনের নেতৃত্বে সমস্ত বিপদ ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বলশেভিক সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।


সোভিয়েট ইউনিয়ন
স্কেল
০ ৫০০ ১,০০০ ১,৫০০ ২,০০০
চীনের প্রজাতন্ত্র
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয়
রুশিয়
কাজাকস্তান
আফগানিস্তান
জার্মানী
উক্রেইন
ফিনল্যান্ড
এস্তোনিয়া
লাটভিয়া
কৃষ্ণ সাগর
জর্জিয়া
আর্মেনিয়া
আজারবাইজান
তুর্কমেনিয়া
উজবেকিস্তান
তাজিকিস্তান
কিরঘিজিস্তান
সিঙ্কিয়াং

রুশ বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কীর্তি শ্রেণীহীন নূতন সমাজ সৃষ্টির চেষ্টা। ধনী-দরিদ্র, শ্রমিক-মালিক, চাষী-জমিদার, মানুষের মধ্যে এই সকল বহুযুগব্যাপী বিভেদ ব্যবধান দূর করার জন্যে সোভিয়েট সরকার সমাজ ব্যবস্থায় বিরাট এবং মূলগত পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। সোভিয়েটে পুঁজিপতি ও জমিদারদের কলকারখানা ও জমির মালিকানা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। শিল্পের মালিক সেখানে দেশের জনসাধারণ। জনসাধারণের পক্ষ হইতে সরকার সমস্ত শিল্প পরিচালনা করে। কৃষকদের মধ্যে আবাদ-যোগ্য জমি বণ্টন করিয়া দিয়া যাহাতে তাহারা ছোট ছোট জোত চাষ না করিয়া সমবেতভাবে বড় বড় কৃষিক্ষেত্র গড়িয়া তুলে তজ্জন্য প্রচার চালানো হয় এবং নানাবিধ সুবিধা দেওয়া হয়। এইভাবে সোভিয়েটে বিরাট বিরাট কৃষিক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই সকল কৃষিক্ষেত্রে চাষ-আবাদ করা হয়। এইগুলিকে বলা হয় যৌথ কৃষিক্ষেত্র বা খামার। জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সে দেশে সরকার প্রায় বিনা মাহিনায় সর্বপ্রকার শিক্ষালাভের এবং বিনা পয়সায় সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। কয়েকটি পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার মারফৎ এই বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

রুশ বিপ্লবের কীর্তি

সোভিয়েট নিজের পায়ে দাঁড়াইবার পূর্বেই লেনিনের মৃত্যু (১৯২৪) হয়। লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কীর সহিত স্টালিন ও বলশেভিক দলের গুরুতর মতবিরোধ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ট্রট্স্কীকে দেশ ত্যাগ করিতে হয়। মেক্সিকোতে বসবাসকালে তিনি এক আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

স্টালিনের নেতৃত্বে এবং লেনিনের নির্দেশ ও নীতি অনুসারে

পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হয়। ইহার ফলে দেশের সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, শিল্প ও কৃষিতে আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং বেকার সমস্যার সমাধান ঘটে। জারের আমলের পশ্চাৎপদ রাশিয়া আজ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সমুন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।



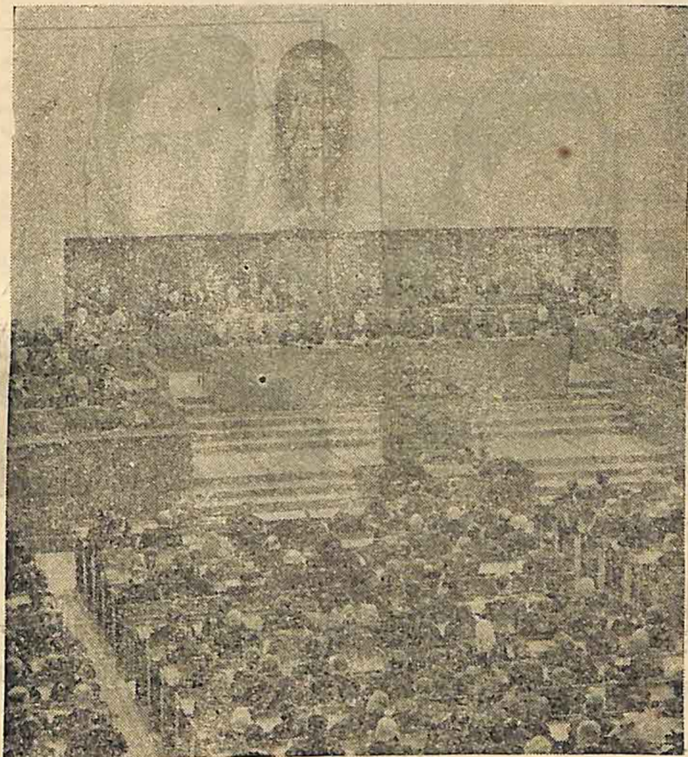
স্টালিন

সোভিয়েটসমূহের দ্বারাই বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়ন শাসিত হয়। সোভিয়েট হইতেছে বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত স্থানীয় সমিতি। আমাদের দেশে 'পঞ্চায়েৎ' বলিতে যাহা বুঝায় সোভিয়েট অনেকটা তাহারই আধুনিক রূপ। ১৯৩৭ সালের পূর্বে জনসাধারণের নির্বাচিত সোভিয়েটগুলিই সমগ্র দেশের সোভিয়েট কংগ্রেস নির্বাচন করিত এবং সারা ইউনিয়নের সোভিয়েট কংগ্রেসই ছিল চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

শাসন ব্যবস্থা

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে উক্ত সংবিধান অনুয়ায়ী নির্বাচন ইত্যাদি হইয়া থাকে। নূতন সংবিধান অনুসারে এখন সোভিয়েটের সর্বোচ্চ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান হইতেছে "সুপ্রীম সোভিয়েট"। এই সর্বোচ্চ সোভিয়েট দুইটি পরিষদে বিভক্ত; ইউনিয়নের সোভিয়েট এবং জাতিসমূহের সোভিয়েট। সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিবাসীদের প্রতি তিন লক্ষ লোক ইউনিয়নের সোভিয়েটে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। সোভিয়েটের বিভিন্ন জাতির ভিত্তিতে গঠিত ইউনিয়ন রিপাবলিক বা রাজ্য, স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক

অঞ্চল ও জাতীয় এলাকাগুলি জাতিসমূহের সোভিয়েটে ২৫ হইতে ১ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে। যে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ও পরিচালনায় বিপ্লব সংগঠিত হয়, সেই পার্টিই নূতন সমাজ রাষ্ট্র গঠন



সর্বোচ্চ সোভিয়েটের অধিবেশন

ব্যাপারে অগ্রণী। এইভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্যান্য দেশের ন্যায় বিরোধী কোন রাজনৈতিক দল নাই।

রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এশিয়ার বহু পরাধীন ও নির্যাতিত জাতি

ছিল। জারের আমলে তাহাদের কোন মর্যাদা দেওয়া হইত না। সোভিয়েট ইউনিয়নে ঐ সকল জাতি নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উজবেক, কাজাক, তাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন নিপীড়িত



জাতীয় পরিচ্ছদে আধুনিক
উজবেক নারী



জাতীয় পরিচ্ছদে আধুনিক
তাজিক নারী

জাতিগুলির স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র গঠিত হইয়াছে, তাহাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির অবাধ বিকাশ ঘটিতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন বর্তমানে মোট ১৬টি প্রজাতন্ত্রের সমষ্টি।

অনুশীলনী

১। রুশ-বিপ্লবের প্রভাব ফরাসী বিপ্লবের সহিত তুলনীয় কেন?
২। ১৯১৭ সালের বিপ্লব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ :—
(ক) কার্ল মার্ক্স, (খ) লেনিন, (গ) স্টালিন (ঘ) ট্রট্স্কী।
৪। রুশবিপ্লবের সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি কি?

———

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মহাযুদ্ধ, রাষ্ট্রসংঘ, সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধেই দুইটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। এই দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে নানাদেশের ক্ষতি হইয়াছে অপরিমিত। ঘরে ঘরে উঠিয়াছে হাহাকার। দুইটি মহাযুদ্ধ মানুষের ইতিহাসের ধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। উভয় মহাযুদ্ধই জার্মাণীই বাধাইয়াছিল, কিন্তু শুধু মাত্র জার্মাণীকে উহার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। দেশাত্মবোধের ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যকামনা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অপরিসীম পরদেশলিপ্সা, এবং উপনিবেশ ও বাণিজ্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এইগুলিই উভয় মহাযুদ্ধের মূল কারণ।

যে জাতীয়তাবোধ একদিন জার্মাণী, ইটালি প্রভৃতি রাষ্ট্র সংগঠনে সহায়তা করিয়াছিল, সাম্রাজ্যের যুগে সেই জাতীয়তাবোধই মারাত্মক তীব্র আকার ধারণ করিয়া ইয়োরোপকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিল। কে কাহাকে হটাইয়া সারা বিশ্বে ক্ষমতা বিস্তার করিবে তাহা লইয়া রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রবল বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দিল। উভয় মহাযুদ্ধই এই বিরোধ ও সংঘর্ষের অনিবার্য পরিণতি।

বিসমার্কের আমলে রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মাণী ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হইলে এবং ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে জার্মাণীর জয় হইলে জার্মাণী ইয়োরোপের অতি দুর্ধর্ষ শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। শিল্পে ও বিজ্ঞানে জার্মাণী দ্রুত উন্নতি লাভ করিল। সুগঠিত বিশাল সৈন্যবাহিনী, জার্মাণীর সামরিক ঐতিহ্য, নব উদ্দীপিত দেশাত্মবোধ জার্মাণীকে ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম-এর মদগর্বী নেতৃত্বে জার্মাণী সারা জগতে প্রভুত্ব বিস্তারের

স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। এদিকে জার্মাণীর সামরিক শক্তি, বাণিজ্য ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা, সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ব্রিটেনের মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করিল। জার্মাণীর নিকট যুদ্ধে পরাজিত ফ্রান্স নূতন আক্রমণের আশাঙ্কায় বিপদ গণিল। এইভাবে অল্পকালের মধ্যেই ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জ দুইদলে বিভক্ত হইয়া গেল।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের সহিত জার্মাণী মৈত্রী স্থাপন (১৮৭৯) করিলে পূর্ব ইয়োরোপের জার্মাণ প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা রাশিয়াকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। ফ্রান্স ও রাশিয়া মিত্ররূপে পরস্পরকে সাহায্য করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইল। ইতিমধ্যে ইটালি ফ্রান্সের সহিত শত্রুতাবশতঃ জার্মাণীর সঙ্গে যোগ দিল। ব্রিটেনের তখন আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকার উপায় রহিল না।

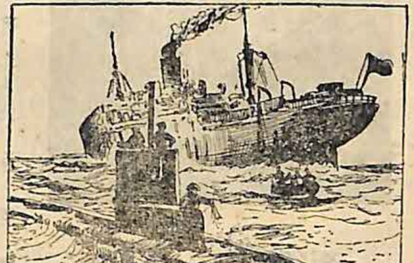
ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ব্রিটেন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মাণীর শক্তি প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইল। উভয় পক্ষের মধ্যে সামরিক শক্তির প্রতিযোগীতা চলিতে লাগিল তীব্র ভাবে। যুদ্ধ ব্যতীত ইহার আর কি পরিণতি হইতে পারে ?

প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা

বারুদ গাদা হইয়াই ছিল ; একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মুহূর্তের মধ্যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। বোস্‌নিয়া অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বোস্‌নিয়ার সার্ব জাতীয়তাবাদীরা অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অধীনতা মানিতে রাজী হন নাই। সার্বদের অধীন রাখার প্রতিবাদে জনৈক সার্ব বিপ্লবী বোস্‌নিয়ার সারাজেভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনাণ্ডকে হত্যা করিল। অস্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করিয়া এমন কয়েকটি সর্তে ক্ষতিপূরণ দাবি করিল যেগুলি সার্বিয়ার পক্ষে মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না।

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অস্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে জার্মাণীও আক্রমণে যোগ দিল। রাশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন একে একে সকলেই জার্মাণ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। মহাযুদ্ধের আগুন পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। রাশিয়ার চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী তুরস্ক যোগ দিল জার্মাণী ও অস্ট্রিয়ার সহিত। ইটালি শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেয়। ক্রমে জাপান, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এমন কি চীন পর্যন্ত এই মিত্রপক্ষে যোগ দিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।

অতীতে এমন বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ কখনও হয় নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে উভয় পক্ষ যে সকল ভয়াবহ মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে তাহার ফলে বহু দেশের বহু অঞ্চল ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়। প্রাণ হারায় লক্ষ লক্ষ মানুষ। বৃহদাকার কামান, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিণ বা ডুবো-জাহাজ, বিষাক্ত গ্যাস, বিমান হইতে বোমাবর্ষণ এবং পরিখা-যুদ্ধ স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে মৃত্যু ও ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করে। সাবমেরিণের আক্রমণে সমুদ্রে কত নিরীহ যাত্রী প্রাণ হারায় তাহার সংখ্যা নাই। ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত এই চারি বৎসরব্যাপী যুদ্ধে পাঁচটি মহাদেশের ৩০টি জাতি যোগ দিয়াছিল। মোট সাড়ে ছয় কোটি সৈন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, নিহত হইয়াছিল ৮৫ লক্ষ। আহত, শত্রুহস্তে বন্দী এবং নিরুদ্দেশের সংখ্যা ২ কোটি ৯০ লক্ষ।


সাবমেরিণের আক্রমণে একটি জাহাজ জলমগ্ন হইবার দৃশ্য

মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা

এমন কোন দেশ ছিল না যে দেশের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠে নাই। অনশনে এবং রোগে মরিয়াছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। প্রথম মহাযুদ্ধ নামে খ্যাত এই ধ্বংসযজ্ঞে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়ের পরিমাণ টাকার অঙ্কে সাড়ে তিন হাজার কোটি ডলার অর্থাৎ সতেরো হাজার কোটি টাকা।



কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম

১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে রাশিয়া যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। ইহার পূর্বেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। রাশিয়া সরিয়া দাঁড়ানোর ফলে কিছুটা সুবিধা হইলেও দীর্ঘ যুদ্ধে অবসন্ন জার্মাণীর আর যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বুলগারিয়া ও অক্টোবর মাসে তুরস্ক আত্মসমর্পণ করিল। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যও এই সময় ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। পশ্চিম রণক্ষেত্রে জার্মাণ বাহিনীর পরাজয়ের পর জার্মাণীর অভ্যন্তরে প্রবল অসন্তোষ ও বিক্ষোভ কাইজারের শাসনযন্ত্রকে বিকল করিয়া দেয়। ফলে, কাইজার পলায়ন করেন এবং জার্মাণীতে সাধারণতন্ত্র (প্রজাতন্ত্র) ঘোষিত হয়। নূতন জার্মাণ সরকার যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানায়। ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর এই আবেদন গৃহীত হয়। এই দিনটিকে এখনও যুদ্ধবিরতি দিবসরূপে পালন করা হয়।

যুদ্ধ বিরতি

যুদ্ধ বিরতির পর কয়েক মাস ধরিয়া শান্তি চুক্তির সর্তাদি লইয়া মিত্রপক্ষের মধ্যে আলোচনা চলে। এই আলোচনার জন্য ফ্রান্সের ভের্সাই শহরে ১৯১৯ সালের ৮ই জানুয়ারী শান্তি মহাসম্মেলনের অধিবেশন শুরু হয়। ভের্সাই শহরে অনুষ্ঠিত শান্তি মহাসম্মেলনে গৃহীত সন্ধিপত্রের নাম হয় ভের্সাই-এর সন্ধিপত্র। মিত্রশক্তিবর্গ ও জার্মাণী ২৮শে জুন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করে। অস্ট্রিয়া প্রভৃতি পরাজিত রাষ্ট্রগুলি আরও পরে অন্যান্য সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দেয়।

ভের্সাই-এর সন্ধিপত্র

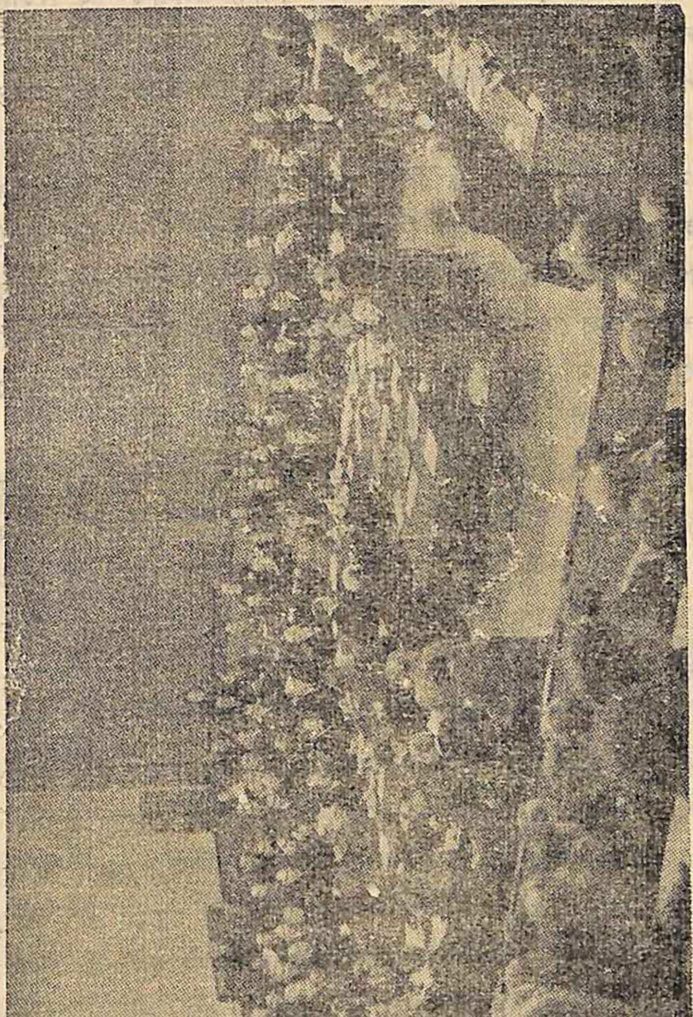
ভের্সাই সন্ধিপত্রের অন্যতম মূলনীতি ছিল এই যে প্রত্যেক জাতিকে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দিতে হইবে। এই নীতি অনুসারে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়া হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি নূতন রাষ্ট্র গঠন করা হইল। কিন্তু উক্ত নীতি সকল ক্ষেত্রে মানিয়া চলা হইল না। জার্মাণীকে দুর্বল করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধিশালী "সার" (Saar) জেলাকে জার্মাণী হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। নানা অজুহাতে আরও অনেক অঞ্চলে জার্মাণীর অধিকার অস্বীকার করা হইল।

জার্মাণীর সমস্ত উপনিবেশ কাড়িয়া লইয়া মিত্রশক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইলেন। সন্ধি-সর্ত অনুসারে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জার্মাণী প্রায় পঙ্গু হইয়া গেল, জার্মাণীর সামরিক শক্তিও আর থাকিল না। ইহার উপর চাপানো হইল বিপুল ক্ষতিপূরণের বোঝা। ভের্সাই সন্ধিপত্রের কঠোর সর্তসমূহ জার্মাণ জনসাধারণের মনকে বিষাইয়া দিল। মিত্রশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করিয়া তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতে

লাগিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ আংশিকভাবে এই বিদ্বেরের মধ্যেই নিহিত ছিল।

শান্তি মাহাসম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হইতেছে রাষ্ট্রসংঘের (জাতিসংঘও বলা হয়), প্রতিষ্ঠা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি উইলসনই রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা তুলিয়াছিলেন। পরস্পরের সহিত বোঝাপাড়া করিয়া রাষ্ট্রগুলি শান্তি রক্ষা করিয়া চলিবে এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা হয়। ভেসাই-এর ব্যবস্থা কার্যকরী হওরা মাত্র, অর্থাৎ ১৯২০ সালের গোড়াতেই পূর্বস্বীকৃত বিধানপত্র ("কভোনাণ্ট") অনুসারে বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ স্থাপিত হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যাপারে উদ্যোগী হইলেও শেষ পর্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘে যোগ দেয় নাই। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি ও নিরপেক্ষ কয়েকটি রাষ্ট্র প্রথমে রাষ্ট্রসংঘে যোগ দেয়। পরে জার্মাণী প্রভৃতি বিজিত রাষ্ট্রগুলিও উহার সদস্য হয়। পৃথিবীর প্রায় ৬০টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৫০টি রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘে যোগ দেয়। ছোটখাট বিরোধ, নিষ্পত্তির ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘ কিছুটা সাহায্য করিতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আইনগত বিরোধ মীমাংসার জন্য হেগ-এ একটি বিশ্ব-আদলত স্থাপিত হয়। কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গ মুখে বড় বড় বুলি আওড়াইলেও কাজের বেলায় নিজেদের স্বার্থ এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করিতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে বৃহৎ শক্তিবর্গের কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার কোন ক্ষমতা ছিল না। গ্রীসের সামান্য ত্রুটির জন্য ইটালি কর্তৃক কর্ফুদ্বীপে গোলাবর্ষণ, পোল্যাণ্ড কর্তৃক লিথুনিয়ার ভিল্না অধিকার, চীনে জাপানের আক্রমণ, ইটালি কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকার ইত্যাদি ঘটনা একের পর একে ঘটিয়া গেলেও রাষ্ট্রসংঘ কিছুই

রাষ্ট্র বা জাতিসংঘ (League of Nations)



রাষ্ট্রসংঘের (League of Nations) অধিবেশন

করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে জাপান, জার্মাণী ও ইটালি রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করিল। এই ভাবেই রাষ্ট্রসংঘের আয়ু ফুরাইয়া আসিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের অস্তিত্ব লুপ্ত হইল।

মহাযুদ্ধের ফলে যুদ্ধে লিপ্ত সমস্ত দেশেরই ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল বিপুল। ভের্সাই সন্ধিপত্রে বিজয়ী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের দিকেই লক্ষ্যপাত করা হইয়াছিল। ইহাতে একদিকে বিজিত রাষ্ট্রগুলি যেমন পঙ্গু হইয়া গেল তেমনই বিজয়ী দলভুক্ত হইয়াও ইটালির মত দুর্বল রাষ্ট্রগুলি তেমন কিছু লাভবান হইল না, জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষুধাও মিটিল না। ফলে দেখা দিল নূতন নূতন সমস্যা।

ইটালি ছিল শিল্প, কৃষি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অনুন্নত। মহাযুদ্ধের আঘাত ইটালি সামলাইতে পারিল না। শ্রমিকদের মধ্যে ঘন ঘন বিক্ষোভ দেখা দিতে লাগিল। মুদ্রামূল্যের কোন স্থিরতা না থাকায় সমগ্র দেশে অর্থনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত হইয়া উঠিল।

মুসোলিনীর অভ্যুদয়

মন্ত্রিসভার পর মন্ত্রিসভার পতন হইতে লাগিল। এই সময় ইটালিতে বেনিতো মুসোলিনী (১৮৮৩-১৯৪৫) নামক একজন রাজনৈতিক নেতার প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমে সমাজতন্ত্রবাদীরূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেও ক্রমেই মুসোলিনী ঘোরতর সমাজতন্ত্র বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। গণতন্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। শক্তিশালী নেতা রাষ্ট্রের প্রতিভূরূপে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া জয়যাত্রায় অগ্রসর হইতে পারিবেন—ইহাই ছিল মুসোলিনীর মূল বক্তব্য। তাঁহার এই বক্তব্য যাহারা মানিয়া লইল তাহাদের লইয়া তিনি ফ্যাশিস্টদল গঠন করিলেন। প্রাচীন রোমে একসঙ্গে বাঁধা কয়েকটি দণ্ডকে রাজশক্তির চিহ্নস্বরূপ

ব্যবহার করা হইত। তাহার লাটিন নাম হইতেই "ফ্যাশিসমো" বা "ফ্যাশিজম্" কথাটির উৎপত্তি।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাশিষ্ট দল তথাকথিত "রোম অভিযান" করিয়া বিনা যুদ্ধে রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা অধিকার করে। মুসোলিনী প্রধানমন্ত্রী হন। কিছুকাল পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা বহাল রাখার পর মুসোলিনী উহা বাতিল করিয়া দিয়া ফ্যাশিষ্ট দলের একাধিপত্য স্থাপন করেন এবং নিজে ইটালির "ডিক্টেটর" বা সর্বময় কর্তা হইয়া দাঁড়ান।

মুসোলিনীর ক্ষমতা লাভ

সমস্ত বিরোধী দলকে চূর্ণ করিয়া মুসোলিনী বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন এবং সামরিক ঘাঁটি সমূহ নির্মাণে দেশের সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করেন। প্রথম দিকে রাস্তাঘাট, বড় বড় বাড়ী নির্মাণ, দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন ইত্যাদি কাজের দ্বারা মুসোলিনী ইটালির যেটুকু উন্নতি করিয়াছিলেন যুদ্ধ-সজ্জার ফলে ক্রমেই সেই উন্নতির চিহ্ন লুপ্ত হইয়া ইটালির অবস্থার অবনতি হইতে থাকে।



মুসোলিনী

যুদ্ধে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত জার্মাণীতে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতেছিল। দুর্বল পার্লামেণ্টারী গভর্ণমেণ্টের কোন সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা ছিল না। সেদিন গুরুতর অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কট জার্মাণীর

জনসাধারণকে নিরাশ, ক্ষিপ্ত ও বেপরোয়া করিয়া তুলিল। এডল্ফ হিটলারের নেতৃত্বে ইটালির ফ্যাশিষ্ট দলের অনুরূপ একটি নাৎসী দল এই সময় দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে থাকে। ভের্সাইর সন্ধিপত্র বাতিল করার জন্য হিটলার জনসাধারণকে যে আহ্বান জানান তাহাই জার্মাণদের মনে সাড়া দেয়।

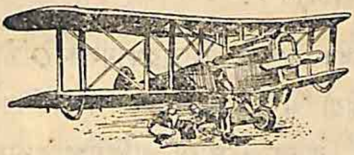
হিটলারের অভ্যুত্থান

১৯৩৩ সালে রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীদের ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র নাৎসীদের কবলিত হয়। হিটলারের একনায়কত্বে ঐক্যবদ্ধ জার্মাণী আবার ইয়োরোপে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। ভের্সাই সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করিয়া হিটলার বিরাট বাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। ইটালি জার্মাণীর সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়া শক্তি বৃদ্ধি করে। এদিকে প্রাচ্যে জাপান সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

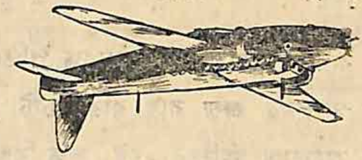


এডল্ফ হিটলার

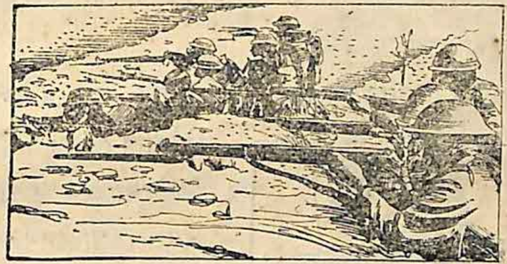
আপন শক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসী হিটলার বিদ্যুৎগতিতে দ্রুত আঘাতের পর আঘাত হানিয়া অষ্ট্রিয়া অধিকার করিলেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেনল্যাণ্ড কাড়িয়া লইয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকে তাঁদের রাষ্ট্রে পরিণত করিলেন। এই সময় রাশিয়া নাৎসী আক্রমণের বিপদ সম্পর্কে ব্রিটেন, ফ্রান্স, প্রভৃতি রাষ্ট্রকে সচেতন



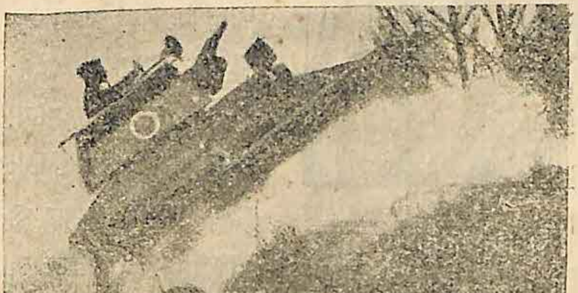
প্রথম মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত বিমান



দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত বিমান



পরিখায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত গ্যাস-মুখোস পরিহিত সৈন্যদল



ট্যাঙ্কের অগ্রগতি

করার জন্য এবং সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক মৈত্রী স্থাপনের জন্য বার বার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। জার্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করিবে এই অন্ধ বিশ্বাসে ব্রিটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন রাশিয়া স্বীয় শক্তি সংহত করার উদ্দেশ্যে নাৎসী জার্মাণীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। নিশ্চিন্ত হিটলার ইহার পরই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্র পোল্যাণ্ড আক্রমণ (১৯৩৯) করেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়।

ইতিমধ্যে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেনের হিটলার-তোষণ নীতির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের জনমত প্রবল হইয়া উঠে এবং চেম্বারলেন মন্ত্রিসভার পতন হইলে উইন্‌ষ্টন্ চার্চিল নূতন মন্ত্রি-সভা গঠন করেন। যুদ্ধে ফ্রান্সের পতন আসন্ন হইয়া উঠিলে ইটালি জার্মাণীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। জার্মাণীর দ্রুত জয়লাভে আতঙ্কিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ক্রমেই ব্রিটেনকে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিতে থাকে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের দুইটি ঘটনা সমগ্র যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করে।


উইন্‌ষ্টন্ চার্চিল

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে জার্মাণী সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে এবং ডিসেম্বর মাসে জাপান চূড়ান্ত বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিচয় দিয়া

অকস্মাৎ পার্ল পোতাশ্রয়ে হানা দিয়া মার্কিণ নৌবহর ধ্বংস করে। ইহার ফলে দুইটি শক্তিশালী নিরপেক্ষ রাষ্ট্র জার্মাণী ও তাহার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট (১৮৮২-১৯৪৫) ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল ষ্টালিন যুদ্ধের নূতন ও মহত্তর লক্ষ্য ঘোষণা করিয়া নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন।



প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট

রাশিয়া সহ সমগ্র ইয়োরোপ, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলি যুদ্ধের প্রধান অঞ্চলে পরিণত হয়। বিশ্বব্যাপী এমন ভয়াবহ যুদ্ধ ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় নাই। বিজ্ঞানের প্রয়োগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যন্ত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। বিমান শক্তির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া যায়। বোমারু বিমানের আক্রমণে বিপক্ষকে বিধ্বস্ত ও দুর্বল করা যুদ্ধের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। এই যুদ্ধে সামরিক ও অ-সামরিক লোকজনের মধ্যে যে সীমারেখা এতকাল টানা হইত, তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। সমগ্র দেশের সমগ্র সম্পদ যুদ্ধে নিয়োজিত হয়। এই সামগ্রিক যুদ্ধে (Total War) অধিকৃত দেশগুলিতে নাৎসীরা অকথ্য ও বর্বর নির্যাতন চালায়। লক্ষ লক্ষ নিরীহ এবং অ-সামরিক

নরনারী ও শিশুকে বন্দীনিবাসে আবদ্ধ রাখিয়া নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

যুদ্ধ বাধিবার পর দ্রুত আক্রমণ চালাইয়া জার্মাণী প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ এবং জাপান প্রায় সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া অধিকার করে। জাপ বাহিনী ভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায়।

যুদ্ধ ও তাহার পরিণতি

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মদমত্ত জার্মাণী সোভিয়েট আক্রমণ করে। প্রথম দিকে সাফল্যে উল্লসিত জার্মাণ বাহিনী যখন মস্কোর পতন আসন্ন বলিয়া মনে করে তখনই রুশ বাহিনী প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ সুরু করে। ফলে জার্মাণ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ আরম্ভ হয়। এদিকেও আফ্রিকাতে জার্মাণ বাহিনী পরাজিত হয় এবং মিত্রপক্ষ ইটালি আক্রমণ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির যুদ্ধে জাপানের পরাজয় হইতে থাকে এবং চীনেও জাপানের অগ্রগতি অচল হইয়া আসে। এশিয়ায় মিত্রপক্ষের পাল্টা আক্রমণ, ষ্টালিনগ্রাডে জার্মাণীর পরাজয় এবং ফ্রান্সের উপকূলে মিত্রবাহিনীর আক্রমণে দ্বিতীয় রণাঙ্গণের সৃষ্টি হওয়ায় জার্মাণী ও ইটালির পরাজয় ঘটে। সোভিয়েট বাহিনী বার্লিন অধিকার করিলে হিটলার আত্মহত্যা করেন। ইটালিতে মুসোলিনীও নিহত হন। ইহার পর জার্মাণী ও ইটালি আত্মসমর্পণ করে। জাপান আরও কিছুকাল লড়িয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ বাহিনী এটম বোমা ব্যবহার করিলে তাহার ভয়াবহ ধ্বংস-শক্তি দেখিয়া বিমূঢ় জাপানও আত্মসমর্পণ করে।

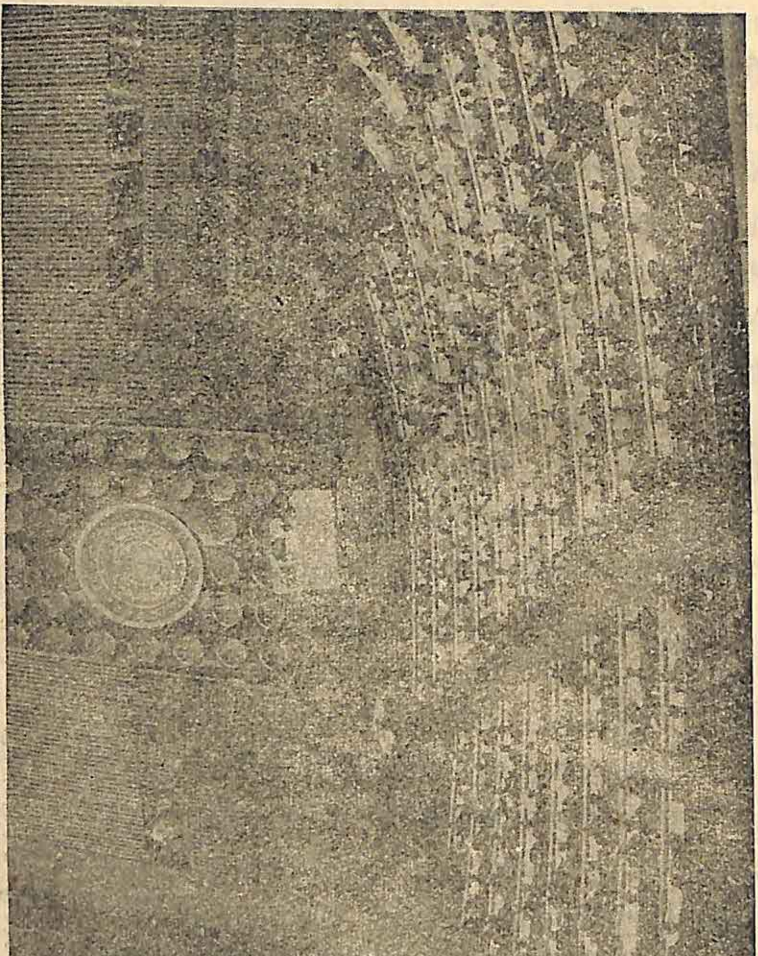
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইলেও বিজয়ী শক্তিগুলির মতভেদের ফলে আজও চূড়ান্তভাবে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। কোন সর্বসম্মত সন্ধিপত্র আজও রচিত হয় নাই। ভারত প্রভৃতি কয়েকটি দেশ

নিরপেক্ষ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে জগৎ আজ দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে একদিকে রহিয়াছে চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া চীন পর্যন্ত রাষ্ট্রগুলির একটি শিবির (প্রাচ্য জোট), অপরদিকে রহিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের নেতৃত্বে ইয়োরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ (পশ্চিমী জোট)। বলশেভিক বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত নূতন ধরণের সমাজ ও গভর্ণমেণ্ট গঠনের চিন্তাই প্রথম পক্ষের মনে প্রবল। অপর পক্ষ উহার বিরোধী, তাহারা মনে করে ঐ আদর্শ মানুষের স্বাধীনতা লোপ করিবে।

উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ যখন বাড়িয়া চলিয়াছে তখনই আবার বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি বজায় রাখিয়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হইয়াছিল।

সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরও ব্যাপক ভিত্তিতে ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ লইয়া স্থাপন করা হইয়াছে সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ বা রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত সংস্থা (United Nations Orgonisation, সংক্ষেপে U. N. O). সমস্ত জাতির কয়েকটি অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ একটি সনদ-রচনা করেন। এই সনদের ভিত্তিতেই নূতন সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বের রাষ্ট্রসংঘ অপেক্ষা সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা অনেক বেশি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি বিরোধের মীমাংসা নবগঠিত রাষ্ট্রসংঘ করিয়াছে। অবিচার অনাচার রোধের জন্য চেষ্টাও করিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ রাষ্ট্রই সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের সদস্য। এই রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমেই বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার ও বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা



সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ (U. N. O.) অধিবেশন

চলিতেছে। স্বাধীন ভারত সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের নেতৃস্থানীয় সদস্যরূপে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতেছে।

সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থা (U.N.E.S.C.O.), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O.) প্রভৃতি বিবিধ সংস্থা শান্তিপূর্ণভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের ব্যাপারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

অনুশীলনী

১। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ কি ?

২। 'ভের্সাই-সন্ধিপত্রের কঠোর সর্তাবলীর মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল'—ব্যাখ্যা কর।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কে যাহা জান লিখ :—

(ক) ভের্সাই-সন্ধিপত্র (খ) রাষ্ট্রসংঘ, (গ) মুসোলিনী, (ঘ) হিটলার, (ঙ) কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম।

(৪) প্রথম মহাযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

(৫) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চূড়ান্তভাবে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে কি ? যদি না হইয়া থাকে ত কেন হয় নাই ?

(৬) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মাণী, ইটালী ও জাপানের যোগদানের কারণ কি ?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভারত এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা লাভ ঃ চীনে বিপ্লব

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ইয়োরোপীয় জাতিগুলির দ্রুত সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ। এই সময়ের মধ্যে কার্যতঃ সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকা বিভিন্ন ইয়োরোপীয় জাতির পদানত হইয়াছিল। ইয়োরোপীয় জাতিগুলি কোথাও বা অস্ত্রধারণ করিয়া বাহুবলে দেশজয় করিয়াছে কোথাও বা সুকৌশলে সন্ধি সর্তাদির মারফত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলি নূতন শিল্পপ্রধান সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে, বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার চাপে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মনে জাগিয়াছে জাতীয়তাবোধ দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের দেশে দেশে সুরু হইয়াছে স্বাধীনতা সংগ্রাম। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামগুলির মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতের পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিকে ভিত্তি করিয়াই ভারতের পুরাতন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিশ শাসনে ব্রিটিশ স্বার্থে ভারতে রেলপথ স্থাপিত হইল, টেলিগ্রাফ প্রবর্তিত হইল। ইহার ফলে একদিকে সারা ভারতে ইংরাজদের আধিপত্য যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তেমনই

আর একদিকে বিলাতী পণ্যে বাজার ছাইয়া গেল। বড় বড় বন্দর হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী হইতে লাগিল। ভারতীয় গ্রামগুলির স্বয়ং সম্পূর্ণতা আর থাকিল না, বিদেশের আমদানি রপ্তানির উপর ভারতের গ্রামগুলি ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া উঠিল।

নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়

ইংরাজ শাসকদের প্রয়োজনেই এদেশের কিছু লোক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভের সুযোগ পাইলেন। ক্রমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত এক নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতে গড়িয়া উঠিল। আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব ও ইংল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতীয় সমাজের সংস্কার সাধনে অগ্রণী হইলেন। রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষী সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসকদের উপর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃঢ় আস্থা ছিল, তাই সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) মত প্রচণ্ড ব্যাপক প্রচেষ্টায় তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল না। ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই ভারতের উন্নতি হইবে এই আশা তাঁহাদের ছিল। কিন্তু ক্রমে এই আশা নিরাশায় পরিণত হইল। তাঁহারা বুঝিলেন ব্রিটিশশাসনাধীনে দেশের অবস্থার উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত। ইতিমধ্যে পুরাতন সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকার ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষক জমি হারাইয়াছিল। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হওয়ায় অসংখ্য কারিগর, তন্তুবায়, বণিক প্রভৃতি বেকার হইয়াছিল। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের ফলে প্রাণ হারাইয়াছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। সারা দেশে মানুষের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)

আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশের অধীনে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লাভের জন্য আন্দোলন সুরু করেন। তাঁহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও দাবিকে প্রকাশ করার জন্য এবং প্রয়োজনমত শাসকদের সমালোচনার জন্য তাঁহারা ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় মহাসভা (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠা করিলেন। 'কংগ্রেস' নামে এই সংগঠন ক্রমে সুপরিচিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রথম দিকে ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), ফিরোজ শা মেটা, দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। কংগ্রেসের নরমপন্থায় কোন ফল হইল না, কংগ্রেসের একটি দাবিও ব্রিটিশ সরকার গ্রাহ্য করিল না। ইহার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থীদের প্রভাব বাড়িয়া গেল।


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলায় অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিন পাল এবং পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে চরমপন্থী দল প্রবল হইয়া উঠিল। চরমপন্থী দল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইয়া ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিলেন।

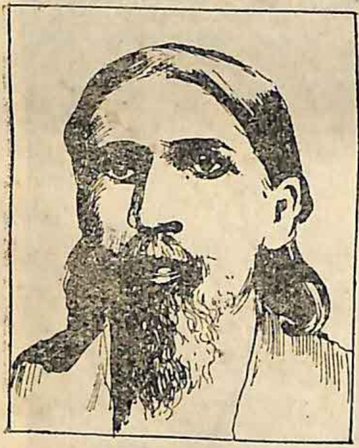
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের শাসন পরিচালনার সুবিধার অজুহাতে বাঙ্গালা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হইল। ইংরাজ সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাঙ্গালী

জাতির মনে বিপুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করিল। বঙ্গ-ভঙ্গ রোধের জন্য আরম্ভ হইল দেশব্যাপী আন্দোলন। বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সংকল্প—এই দুইটি সংকল্পের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর প্রতিবাদ মূর্ত হইয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' সেদিন সারা বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধের বন্যা আনিয়াছিল। 'আনন্দ মঠের' 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি জাতীয় ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল। বিলাতী দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং, সভা ও মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করিল। কবি রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই," কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের বেত মেরে কি মা ভুলাবে, আমরা কি মার সেই ছেলে," রবীন্দ্রনাথের "বাংলার মাটি বাংলার জল" ইত্যাদি স্বদেশী গানে সেদিন বাঙ্গালার আকাশ বাতাস ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট আন্দোলন দমনের জন্য চণ্ডনীতি অনুসরণ করিলেন। বিদেশী



বালগঙ্গাধর তিলক

বিপ্লবীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙ্গালার বিপ্লবীরা গুপ্ত সমিতি গড়িয়া বোমা পিস্তলে উহার জবাব দিলেন। পদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের হত্যা করিয়া শাসক শ্রেণীর মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টিই ছিল বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য। এই কার্য সাধন করিতে গিয়া বহু বাঙ্গালী তরুণ প্রাণ বলি দেন। প্রথম শহীদদের মধ্যে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিংসফোর্ড নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ বিচারককে হত্যা করিতে গিয়া ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল ভুলক্রমে দুইজন শ্বেতাঙ্গিনীকে হত্যা করেন। ধরা পড়িয়া ক্ষুদিরাম অপরাধ স্বীকার করেন এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া শান্তভাবে মৃত্যু বরণ করেন। ফাঁসীর মঞ্চে এইভাবে জীবন দিয়া ক্ষুদিরাম দেশ প্রেমিকদের সম্মুখে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করেন। পুলিসের হাতে ধরা পড়া অনিবার্য বুঝিয়া প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন।



অরবিন্দ

বাঙ্গালী তরুণদের আত্মদান ও দেশব্যাপী আন্দোলন ব্যর্থ হয় নাই। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর বাঙ্গালায় তখন অদম্য স্বাধীনতাকামনার যে বীজ বপন করা হইল, তাহারই ফলে আজ পরাধীনতার গ্লানি মোচন হইয়াছে। বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ

লক্ষ্য করিয়া ব্রিটিশ সরকার শাসন পরিচালনা ব্যাপারে ভারতীয়দের যৎসামান্য অধিকার ও কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়া ১৯০৯ সালে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার প্রবর্তন করেন। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইলেও ভারত প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটেনকে যথাসাধ্য সাহায্য করে। বিপ্লবীরা এই সাহায্যদানের বিরোধী ছিলেন এবং মহাযুদ্ধের সময় বিটেনের শত্রুপক্ষ জার্মাণী, তুরস্ক প্রভৃতির সহায়তায় ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের জন্য তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিপ্লব সংঘটিত না হইলেও তাঁহাদের কার্যকলাপ ও প্রচারের ফলে দেশে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রসারলাভ করে এবং স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়া উঠে। এদিকে ভারতের উদীয়মান শিল্পপতি ও অন্যান্য শ্রেণীরা মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ শাসকদের নিকট হইতে বিশেষ কোন সুবিধা বা অধিকার আদায় করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ হন। ভারতীয়দের সন্তুষ্ট রাখার জন্য ১৯১৯ সালে 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার' প্রবর্তিত হয়। ক্রমে ক্রমে ভারতকে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দিবার নীতিতে ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। ইহার উপর নিষ্ঠুর দমননীতি, বিশেষ করিয়া জেনারেল ডায়ার কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের (অমৃতসর) হত্যাকাণ্ডে সমগ্র ভারত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব

এই সময় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁহার নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দের ২রা অক্টোবর কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত পোরবন্দরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ও অবিচার তাঁহাকে পীড়িত করে এবং উহার প্রতিকারের

জন্য তিনি এক নূতন ধরণের আন্দোলন পরিচালনা করেন। সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ হইয়া অহিংসভাবে অত্যাচার প্রতিরোধের এই আন্দোলন সত্যগ্রহ আন্দোলন নামে সুপরিচিত।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব করেন এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সুরু করেন। সকল ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের সহিত অসহযোগিতা করিয়া সরকারকে অচল করার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। ১৯২০-২১ সালে সমগ্র ভারতে

অসহযোগ আন্দোলন



মহাত্মা গান্ধী

এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। সহস্র সহস্র লোক কারাবরণ করে, বহুলোক সরকারী চাকরী ছাড়িয়া দেয়। বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলনের ফলে ব্রিটেনের সমূহ-ক্ষতি হয়। অসহযোগ আন্দোলনের মূলনীতি ছিল অহিংসা ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য। এই মূলনীতি সকলের মনে সাড়া জাগায়। তুরস্কের প্রতি ব্রিটেন প্রভৃতি মিত্রশক্তিবর্গের আচরণে অসন্তুষ্ট ভারতীয় মুসলমানগণ বিপুল সংখ্যায় ১৯২০ সালের আন্দোলনে যোগ দেন। তুরস্কের সুলতান ছিলেন

সমগ্র মুসলিম জগতের খলিফা বা ধর্মগুরু। ধর্মগুরুর অবমাননাতেই ভারতীয় মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তাই খিলাফৎ আন্দোলন নামে তাহারা যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন রূপে তাহাই অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। জাতীয় কংগ্রেস সত্যকার গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ভারতে ব্রিটিশ সরকার কঠোর দমননীতি অবলম্বন করিয়াও দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন প্রতিহত করিতে অসমর্থ হন। কিন্তু দমননীতি-ক্ষুব্ধ জনসাধারণ গান্ধীজীর অহিংসনীতি অনুসরণ করিতে পারিল না। চৌরীচৌরায় বিক্ষুব্ধ জনতা থানা বেষ্টন করিয়া পুলিস কর্মচারীদের হত্যা করিলে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। গান্ধীজীকে এই সুযোগে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ইহা সত্ত্বেও অসন্তোষের আগুন নিভিল না। ব্রিটিশ সরকার তখন ভারত স্বাধীনতা লাভের যোগ্য কিনা তাহা যাচাই করিয়া দেখার জন্য ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠন করিলেন। ভারতের জনসাধারণ এই কমিশনের সহিত কোনরূপ সহযোগিতা করিল না। ১৯২৯ সালে বড়লাট লর্ড আরউইন ঘোষণা করিলেন যে, ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন (Dominion Status) দেওয়া হইবে। জাতীয় কংগ্রেস ঐ ঘোষণা অগ্রাহ্য করিয়া ঐ বৎসরই পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। ব্রিটিশ সরকার দাবি না মানায় ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। করবন্ধ আন্দোলন, লবণ আইনের ন্যায় অবাঞ্ছনীয় আইন অমান্য করিয়া লবণ প্রস্তুত আন্দোলন (লবণ সত্যাগ্রহ) ইত্যাদি বিভিন্ন আকারে আইন অমান্য আন্দোলন সারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ব্রিটিশ

আইন অমান্য আন্দোলন

সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করিলেও ভারত-সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৩৫ সালে নূতন ভারত-শাসন-আইন পার্লামেণ্টে বিধিবদ্ধ করিতে হয়। এই আইনে প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দেওয়া হইলেও জাতীয়তাবাদীরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিলে জাতীয় কংগ্রেস দেশরক্ষার ব্যাপারে উপযুক্ত অংশগ্রহণের দাবি জানান। ব্রিটিশ সরকার দাবি না মানায় বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন এবং নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মহাত্মা গান্ধী প্রথমে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষভাবে বাধা দানের বিরোধী ছিলেন। তাই দেশব্যাপী আন্দোলন না করিয়া তিনি কয়েকজন নির্বাচিত কংগ্রেস-সেবককে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের অনুমতি দেন। ১৯৪২ সালে ইংল্যাণ্ড হইতে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ এক প্রস্তাব লইয়া ভারতে আসেন। গান্ধীজী উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে না। কয়েক মাসের মধ্যেই "ভারত ছাড়" আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিলে গান্ধীজী নূতন আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময়েই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট গান্ধীজীসহ সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের কারারুদ্ধ করে। নেতারা না থাকা সত্ত্বেও সারা ভারতে বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার লোক কারারুদ্ধ হয়, নানাস্থানে পুলিস ও ফৌজের সহিত জনতার সংঘর্ষ হয় এবং বহুলোক গুলীর মুখে ও ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দেয়। নেতৃত্বহীন আন্দোলন গভর্নমেণ্ট কঠোর হস্তে দমন করে।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন

ভারতের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্র বসু যুদ্ধকালে স্বগৃহে

নজরবন্দী ছিলেন। ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া বার্লিনে উপস্থিত হন। ১৯৪৩ সালে মালয় অঞ্চলে গমন করিয়া সুভাষচন্দ্র জাপ সরকারের সাহায্যে 'স্বাধীন ভারত সরকার' গঠন করেন এবং জাপানীদের হস্তে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজ (স্বাধীন ভারতের বাহিনী) গড়িয়া তোলেন। এই সময়ে দেশবাসী তাঁহাকে নেতাজী আখ্যায় ভূষিত করে।

সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ মণিপুর পর্যন্ত পোঁছিয়া মিত্রপক্ষের বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়।



সুভাষচন্দ্র বসু

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইলে ব্রিটেনে চার্চিল গভর্ণমেণ্টের পতন হয় এবং মিঃ এটলীর নেতৃত্বে শ্রমিক দলের গভর্ণমেণ্টগঠিত হয়। ভারতব্যাপী বিক্ষোভ বিশেষ করিয়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেনাপতিদের বিচারকালে গণবিক্ষোভ এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সন্ত্রস্ত ও সচকিত করিয়া তোলে। ভারত-বাসীকে আর পদানত রাখা যাইবে না বুঝিয়া এটলী সরকার ভারতীয়

নেতাদের সহিত আলোচনার জন্য লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস এবং মিঃ এ, ডি, আলেকজাণ্ডার এই তিন মন্ত্রী লইয়া গঠিত "মন্ত্রী-মিশন" ভারতে প্রেরণ করেন। এই মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা মুসলিম লীগ অগ্রাহ্য করে। মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলীম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র (পাকিস্তান) দাবি করে। এই দাবি লইয়া ভারতের নানাস্থানে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। অসংখ্য নরনারী ও শিশু এই জঘন্য-দাঙ্গায় নিহত হয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের সর্বস্ব হারাইয়া নিঃস্ব উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।



মহম্মদ আলি জিন্না

ভারত বিভাগ ঃ পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের উদ্ভব

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারত বিভাগ করিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক পরিকল্পনা কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের নিকট উপস্থিত করেন। উভয় পক্ষ উহা মানিয়া লওয়ায় ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে "ভারতীয় স্বাধীনতা আইন" ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্তান নামক দুইটি নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। শ্রীজওহরলাল নেহ্‌রু প্রধান মন্ত্রী রূপে স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

ভারতীয় আইন সভার নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া পরে ভারতে গণপরিষদ (বা রাষ্ট্র গঠন পরিষদ) গঠিত হয়। এই গণপরিষদই ভারতীয় পার্লামেণ্ট আখ্যা লাভ করে। গণপরিষদ ভারতীয়

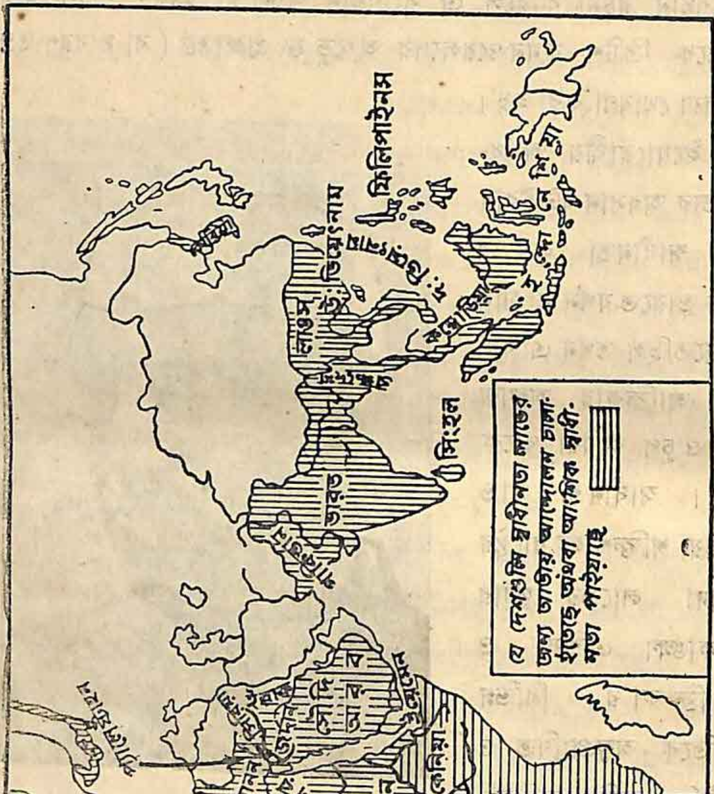
সংবিধান রচনা করিলে ঐ সংবিধান অনুযায়ী ১৯৫০ সালে ভারত রাষ্ট্রকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতন্ত্র (বা সাধরণ তন্ত্র) বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

ইয়োরোপীয় আধিপত্যের অবসান ঘটাইবার ও স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতে যখন সংগ্রাম চলিতেছিল তখন এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশও চুপ করিয়া থাকে নাই। স্বাধীনতা লাভ করিয়া শক্তিশালী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন জাতিকে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিল।


ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু

পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি এবং পার্শ্ববর্তী আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলকে ইয়োরোপীয়রা মধ্য প্রাচ্য নামে অভিহিত করে। পারস্য বা ইরাণ, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি মধ্য প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দেশগুলি বহুল পরিমাণে সাফল্য লাভ করে।

মিশর ও তুরস্কই মধ্য প্রাচ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী হয়। মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্ক ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গকে


প্যালেস্টাইন
লেবানন
সিরিয়া
জর্দান
লিবিয়া
সৌদি আরব
আফ্রিকা
সুদান
ইয়েমেন
গোল্ড-কোষ্ট
কেনিয়া
পাকিস্তান
ভারত
সিংহল
লাওস
উঃ ভিয়েৎনাম
দঃ ভিয়েৎনাম
ফিলিপাইনস
ইন্দোনেশিয়া
প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় গঠিত সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ
যে দেশগুলি স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয় আন্দোলন চালাইতেছে অথবা আংশিক স্বাধীনতা পাইয়াছে

ঘটাইয়া দিয়া শক্তিশালী সাধারণতন্ত্ররূপে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মুস্তাফা কামাল ছিলেন তুরস্কের সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসার। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর মুস্তাফা কামাল অকর্মণ্য সুলতানের রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কূটনীতির সাহায্যে এবং যুদ্ধে গ্রীসকে পরাজিত করিয়া মুস্তাফা কামাল মিত্রশক্তিবর্গকে ভের্সাই-এর ব্যবস্থা সংশোধন করিতে বাধ্য করেন। সাম্রাজ্য হারাইলেও তুরস্ক তুর্কী জাতির জাতীয় রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়।

মুস্তাফা কামালের আদর্শ অনুসরণ করিয়া পারস্যের (ইরাণ) রেজা শাহ্ নামক একজন সৈনিক পুরুষ পারস্যের রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটাইয়া নিজেই ১৯২৫ সালে পারস্যের শাহ্ বা রাজা নির্বাচিত হন। তৈল সংক্রান্ত অবমাননাকর সমস্ত চুক্তি বাতিল করিয়া রেজা শাহ্ পারস্যকে সত্যকার স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেন। ইহার পূর্বে পারস্য নামেমাত্র স্বাধীন ছিল। পারস্যের বিপুল তৈল সম্পদ ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। নানাবিধ সর্তের শৃঙ্খলে কার্যতঃ পারস্যকে পদানত করিয়া তাহারা অবাধে তৈল সম্পদ লুণ্ঠন করিত।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন কয়েকটি আরব দেশ স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে চেষ্টা করিতেছিল। এই দেশগুলিই ইরাক, সিরিয়া, সৌদী আরব, ট্রান্সজর্ডানিয়া প্রভৃতি ছোট ছোট অর্ধ-স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত হয়। সম্প্রতি এইগুলির মধ্যে কয়েকটি পুরাপুরি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। মিশরও ১৯২৩ সালে নামে-স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত হয়। জাতীয়তাবাদীরা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্রিটেনকে দ্রুত পূর্ণ স্বাধীনতা দানে বাধ্য করে। ব্রিটিশ ফৌজ

মিশর হইতে অপসারিত করিয়া মিশরকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার আন্দোলন এতদিনে সাফল্যমণ্ডিত হইতে চলিয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রামের আকারেই প্রকাশ পায়। ইহার কারণও ছিল। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করিয়া অধিকারের পর পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণ কালে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া যায়। স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ এই সকল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় বাধা দেয়। ডাচ বা ওলন্দাজ শাসকদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা ইন্দোনেশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

ফরাসী ইন্দোচীনেও জনসাধারণ সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম চালায়। বর্তমানে হো চি মিনের নেতৃত্বে উত্তর ইন্দোচীন স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ইতিমধ্যেই বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

মালয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী এখনও যুদ্ধ চালাইতেছে। সিংহল ও ব্রহ্মদেশের ক্ষেত্রে কোন গোলযোগ হয় নাই। ভারতকে যখন স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহার কিছু পরেই ব্রিটিশ সরকার সিংহল ও ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়।

এশিয়ায় বর্তমান যুগে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হইল শক্তিশালী জনগণতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠা। ডাঃ সুন ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর হইতেই চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত কুওমিনটাং বা জাতীয়তাবাদী দলের সংঘর্ষ চলিতে থাকে। কুওমিনটাং দলের নেতারা কিন্তু কখনও দেশের প্রকৃত স্বার্থ সিদ্ধির দিকে মন দেন নাই। জাপ আক্রমণ কালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কমিউনিষ্টরা কুওমিনটাং দলের সহিত ঐক্যবদ্ধভাবে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়।

জাপানের পরাজয়ের পর আবার কুওমিনটাং-এর সহিত কমিউনিষ্টদের বিরোধ বাধে। কুওমিনটাং দলে বড় বড় জমিদার, ব্যাঙ্কের মালিক ও ধনপতিদের আধিপত্য থাকায় দরিদ্র কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের প্রতি উক্ত দল আদৌ দৃষ্টিপাত করিত না। কুওমিনটাং গভর্ণমেণ্টের অনাচার, দুর্নীতি এবং অকর্মণ্যতায় চীনের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র কৃষকেরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং কমিউনিষ্টদের সমর্থন করে। বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা মাও সে-তুংকেতাহারা সমগ্র দেশের নেতা বলিয়া মানিয়া লয়। মার্শাল চিয়াং কাইশেক কমিউনিষ্টদের দমন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চীনের ভূভাগ ত্যাগ করিয়া তিনি ফরমোজা (তাইওয়ান) দ্বীপে চলিয়া যান। ১৯৪৯ সালে কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে চীনে জন-গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কুওমিনটাং গভর্ণমেণ্ট এখন ফরমোজা দ্বীপে তাঁহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন।



মাও সে-তুং

জনগণতান্ত্রিক চীনের রাষ্ট্রনায়ক মাও সে-তুং কৃষকের সন্তান। কঠোর সাধনা ও প্রতিভার বলে তিনি আজ সমগ্র চীনের বরেণ্য ও অবিসম্বাদী নেতা। ১৮৯৩ সালের নভেম্বর মাসে হোনান প্রদেশের একটি গ্রামে মাও সে-তুং-এর জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে সারাদিন

কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত, কিন্তু ইহারই মধ্যে অসীম অধ্যবসায়ের সহিত তিনি পড়াশুনা করেন। দেশের দুরবস্থা বাল্যকালেই তাঁহার মনকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। ১৯১১ সালে মাও সে-তুং বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়া ক্রমে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। অবিরাম অধ্যয়ন, কঠিন পরিশ্রম, নিরবচ্ছিন্ন আত্মানুশীলন দ্বারা মাও সে-তুং নিজেকে গড়িয়া তোলেন এবং অচিরেই চীনের জনসাধারণের প্রিয় নেতা বলিয়া গণ্য হন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, দৃঢ়চিত্ত, বিলাস ও আড়ম্বরহীন, অক্লান্তপরিশ্রমী এই মানুষটিকে চীনের জনসাধারণ জাতির শ্রেষ্ঠ নেতা, পথনির্দেশক ও মুক্তিদাতা বলিয়া মনে করেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার আদর্শেই আজ নূতন চীন অনুপ্রাণিত। কিন্তু চীনের বিশেষ পরিবেশে সোভিয়েটের আদর্শ কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইবে মাও সে-তুং ও তাহার সহকর্মীরা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। চীনের বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধানে নূতন চীনের জননেতারা যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাই সমগ্র জাতিকে তাঁহাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করিতে সাহায্য করিয়াছে। প্রাচীন চীন আজ এক পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

অনুশীলনী

(১) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা কর।

(২) ইয়োরোপীয়দের আধিপত্যের অবসানের জন্য ভারতবর্ষ ব্যতীত এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশের সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

(৩) নিম্নলিখিত নেতাদের সম্পর্কে যাহা জান লিখ :—মহাত্মা গান্ধী; সুভাষচন্দ্র বসু; কামাল পাশা (আতাতুর্ক); রেজা শাহ্; মাও সে-তুং।

(৪) আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কে গঠন করিয়াছিলেন? কিভাবে উহা গঠিত হয়?

(৫) বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন হইয়াছিল কেন?

———

ঘটনা পঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ ১৩০০-১৪০০—ইটালিতে রেনেসাঁসের সূচনা।

১৪৫৩—কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন, তুর্কী আক্রমণে বাইজান্তীয় রোমক সাম্রাজ্যের অবসান, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে কন্‌স্টান্টিনোপল ত্যাগী গ্রীক অধ্যাপক ও পণ্ডিতদের আশ্রয় গ্রহণ, ব্যাপক ভাবে গ্রীক দর্শন ও সাহিত্যের অনুশীলন, নূতন ভাবধারার প্রসার।

১৪৫০-১৫৫০—পর্তুগাল ও স্পেনের সাম্রাজ্য বিস্তার। বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারে ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা। পর্তুগাল ও স্পেনের শক্তি হ্রাস।

১৪৭৭—ক্যাক্সটন কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার।

১৪৮৫-১৫৪৬—মার্টিন লুথারের আবির্ভাব এবং ইয়োরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন।

১৪৯২—ক্রিস্‌টোফার কলম্বাসের আমেরিকায় পদার্পণ।

১৪৯৮—ভাস্কো-দা-গামার ভারতে উপস্থিতি।

১৫২৬-১৫৫৬—পানিপথের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ, বাবরের জয়লাভে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত। সম্রাট আকবরের শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্যের বিপুল প্রসার। শিল্পে ও সাহিত্যে উন্নতি ; হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি।

১৫৫৮-১৬০৩—ইংল্যাণ্ডে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকাল। মহাকবি সেক্সপীয়র, দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন প্রভৃতির আবির্ভাব। শিল্পে, বাণিজ্যে বিপুল উন্নতি, নৌশক্তির প্রসার, উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা।

১৬০৩-১৬৮৮—ইংল্যাণ্ডে স্টুয়ার্ট রাজবংশের রাজত্ব, পার্লামেণ্টের সহিত রাজার বিরোধ, গৃহযুদ্ধ, রাজা প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ড, অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা,

ইংল্যাণ্ডে 'গৌরবময় বিপ্লব' স্টুয়ার্ট রাজবংশের পতন, উদীয়মান ধনিক শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি—নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

১৬৫৮-১৭০৭—ভারতে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের শাসনকাল, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা, শিখ ও মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়।

১৭৩৭—পারস্যের রাজা নাদির শাহের ভারত আক্রমণ, মুঘল শক্তি ছিন্নভিন্ন।

১৭৫৭, ২৩শে জুন—পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়ে ভারতে ইংরাজ শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা।

১৭৬১, ২৩শে জুন—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহম্মদ শাহ্ আবদালির নিকট মারাঠাদের পরাজয়। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পর্যুদস্ত হওয়ায় ইংরাজদের সুবিধা।

১৬০০-১৭৬৫—আমেরিকায় ইয়োরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপন, বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের অসন্তোষ।

১৭৭৪-১৭৮৩—আমেরিকায় ঔপনিবেশিকদের সহিত ইংল্যাণ্ডের বিরোধ ও সংঘর্ষ, শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড কর্তৃক আমেরিকার উপনিবেশ সমূহের স্বাধীনতা স্বীকৃত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যুদয়।

১৭৮৯-৯২—ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার, রাজার স্বৈরাচারী শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ, ফরাসী বিপ্লব।

১৭৭০-১৮৩০—ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব, কলকারখানার দ্রুত প্রসার, সমাজ জীবনে বিপুল পরিবর্তন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে ইংল্যাণ্ডের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি, জগতের শীর্ষ স্থানীয় শক্তিরূপে ইংল্যাণ্ডের অভ্যুদয়।

১৭৬১-১৮৫৮—ভারতবর্ষে ইংরাজদের দ্রুত সাম্রাজ্য বিস্তার, ব্রহ্মদেশ অধিকৃত, সিপাহী বিদ্রোহ, ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান।

১৮০৪-১৮১৫—ফ্রান্সের সম্রাটরূপে নেপোলিয়নের অভ্যুদয়, ফ্রান্সের বিপুল সামরিক শক্তি, ইংল্যাণ্ডের সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নেপোলিয়নের পতন।

১৮৪৮-১৮৬১—ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারী শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

বিপ্লব, ইটালি ও জার্মাণীর ঐক্যসাধন, ক্রীতদাস প্রথা লইয়া আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ, ক্রীতদাস প্রথা লোপ।

১৮৪০-১৯০০—আফ্রিকা ও এশিয়ায় ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্য বিস্তার, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগরণের সূচনা।

১৮৭১—নবীন জাপানের অভ্যুদয়, সামন্ততন্ত্রের অবসান।

১৯০৫—পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয়, ভারতে স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ।

১৯০০-১৯১১—চীনে ইয়োরোপীয়দের বিরুদ্ধে 'বক্সার বিদ্রোহ', ডাঃ সুন-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার, মাঞ্চুরাজবংশের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

১৯১৪-১৯১৮—উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জার্মাণীর সহিত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিরোধ, প্রথম মহাযুদ্ধ—একপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অপরপক্ষে জার্মাণী, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক প্রভৃতি, জার্মাণপক্ষের পরাজয়, ভের্সাই সন্ধিপত্র, রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা।

১৯১৭—রাশিয়ার বিপ্লব, মার্চ বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, নভেম্বর বিপ্লবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, ধনিক শ্রেণী ও ভূম্যধিকারীদের ক্ষমতা লোপ, নূতন ধরণের সমাজ সংগঠনের অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা।

১৯১৭-১৯৩৯—ইয়োরোপে অশান্তি, একদিকে সাম্যবাদী ভাবধারার প্রসার, বিপ্লব ও বিদ্রোহ, অপরদিকে সাম্যবাদ-বিরোধী ফ্যাশিজম ও নাৎসীবাদের শক্তি সঞ্চয়; ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির সাম্রাজ্য ও সমৃদ্ধিতে ইটালি ও জাপানের অসন্তোষ, রাষ্ট্রসংঘকে অগ্রাহ্য করিয়া ইটালির আবিসিনিয়া অধিকার ও চীনে জাপানের দ্রুত সাম্রাজ্য বিস্তার। মহাযুদ্ধে পরাজয়, বিপুল ক্ষয় ক্ষতি এবং ক্ষতিপূরণের গুরুভারে প্রপীড়িত জার্মাণীতে হিটলারের অভ্যুদয়। ইটালিতে মুসোলিনী এবং জার্মাণীতে হিটলারের নেতৃত্বে বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠিত।

এশিয়া ও আফ্রিকায় ইয়োরোপীয় আধিপত্যের অবসান ঘটাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের অভ্যুদয়, গ্রীসের পরাজয় এবং শক্তিশালী গণতান্ত্রিক তুরস্ক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। পারস্যে রেজা শাহে্র পহ্লবীর ক্ষমতা গ্রহণ, ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের ক্ষমতা হ্রাস। মিসরে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসার, ব্রিটেন কর্তৃক কিছুটা অধিকার দান। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপ্তি, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ, শাসন সংস্কারের দ্বারা অসন্তোষ দূর করার চেষ্টা ব্যর্থ। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন।

১৯৩৯-১৯৫০—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—জার্মাণী, ইটালি ও জাপানের আক্রমণ, প্রথমে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এবং পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক জার্মাণী প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মাণী, ইটালি ও জাপানের পরাজয়, বিরাট শক্তিরূপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যুদয়, দুই মহাশক্তির মতাদর্শের পার্থক্যে নূতন অশান্তির সূচনা।

১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়', আন্দোলন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দেশ ত্যাগ এবং মালয়ে জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন, মহাযুদ্ধের পর ভারতে প্রবল বিক্ষোভ, নৌবাহিনী বিদ্রোহ, ব্রিটেনে চার্চিল সরকারের পতন, শ্রমিক সরকার কর্তৃক ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ করিয়া পাকিস্তান ও ভারতে রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দান।

ইংল্যাণ্ডের অধীনতা ছিন্ন করিয়া ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ইন্দোচীনে ফরাসীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম, ডাঃ হো চি মিনের নেতৃত্বে উত্তর ভিয়েৎনামে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, ব্রিটেনের নিকট হইতে সিংহল ও ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ, মালয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম

চীনে কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি, মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের গভর্ণমেণ্টের পতন ঘটাইয়া চীনের মূল ভূ-ভাগে কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা, চিয়াং সরকারের ফরমোজা দ্বীপে অবস্থিতি।
